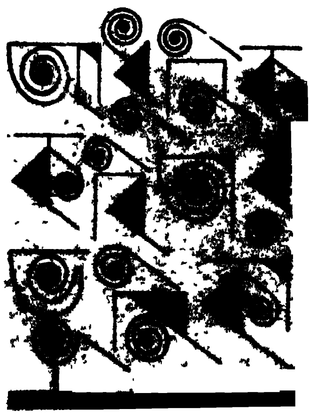


সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রণীত

আধুনিক কবিতার ভূমিকা

প্রকাশ ভবন

আধুনিক কবিতার ভূমিকা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

সবিতা প্রকাশ ভবন
১৭এ, মনোহর পুকুর রোড, কলিকাতা-২৬

প্রথম প্রকাশ ঃ ভাদ্র, ১৩৬৬ বাং

প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ শ্রীগণেশ বসু

দাম ঃ ৩৷৷০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান ঃ শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সবিতা প্রকাশ ভবন পক্ষে প্রকাশক শ্রীসুকুমার দত্ত ১৭এ, মনোহর পুকুর রোড (ত্রিতল), কলিকাতা-২৬ মুদ্রাকর : শ্রীননীমোহন সাহা, রূপশ্রী প্রেস (প্রাঃ) লিঃ, ৯, অ্যাণ্টনী বাগান লেন কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

আধুনিক কবিতার ভূমিকা

কবিতা-বিচার

॥ এক ॥

কবিতা সম্পর্কে যে সামান্য সচেতনতা ইদানীং বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে তাকে প্রগাঢ় করে তুলতে হলে ভালো কাব্য-সমালোচকের দরকার। খারাপ কাব্য-সমালোচকরা যে কবিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন তা নয়, বরং আত্মবোধ নিবেদন করবার সৎসাহস দেখিয়ে তাঁরা সমাজমনকে কবিতার প্রতি আকৃষ্ট করে যান। পরবর্ত্তী কোনো ভালো সমালোচকের আবির্ভাবে খারাপ সমালোচকের আত্মবোধ যাচাই হয় এবং ভালো সমালোচক কবিতা সম্পর্কে তাঁর স্বকীয় মতামত স্পষ্টতর করবার ভরসা পান। এই উপায়ে কবিতার আলোচনা বেড়ে চলে—কবিতার দিকে অনেকের নজর পড়ে। এখন কবিতার দিকে অনেক বাঙালী শিক্ষিত ব্যক্তি নজর দিতে পারছেন বলে আমাদের একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছে কবি জীবনানন্দ দাশের স্মরণ-সভায় উপস্থিত থাকতে পেরে। জীবনানন্দ সহজ কবি নন। দুর্ব্বোধ্য ও দূরচার বলে তাঁর কুখ্যাতিও করেছেন বহু মান্যগণ্য ব্যক্তি। সে অবস্থা থেকে যে বাংলাদেশ উত্তীর্ণ হতে পেরেছে তা জানতে পারা একটি আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। ইংরেজ কাব্য-সমালোচকেরা সম্প্রতি বলতে চান যে কবির অভিজ্ঞতাই কবিতা। কবিতা যদি কবির ব্যূহ-বন্দী থাকে, তাহলে সে-ব্যূহ ভেদ করবার জন্যে সম্ভবত সপ্তরথীরই দরকার—একটি রথী সেই অভিমন্যু-চক্রে প্রবেশ করতে অসমর্থ। কথাটি নিরর্থক নয়। একটি কবির অভিজ্ঞতা জানতে হলে সপ্ত সমালোচক-রথীরই দরকার। 'ষড়ভির্ব্বিশ্বরূপৈক-

পাশং' যে কবি-চিত্ত তাকে প্রদক্ষিণ করা এক ব্যক্তির কর্ম্ম হতে পারে না। ষড়্-ইন্দ্রিয়ের পাশবদ্ধ বিশ্বরূপের দর্পণ হল কবিমানস—বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জ্জনে পঞ্চেন্দ্রিয়ের পর অন্তঃকরণ নামক ষষ্ঠেন্দ্রিয়ও কবি-দেহে নিযুক্ত থাকে; সুতরাং সেই অন্তঃকরণ-স্বরূপ মনের খবর জানতে না পারলে বা কবি তা জানিয়ে না গেলে, কবিতার পেছনে ঘোরাঘুরি করা অনর্থক।

সৎ কবি বৈচিত্র্যের সমন্বিত রূপ। বিশ্বচিত্র যেমন চাঞ্চল্য নিয়েও স্থিরতায় আসীন, সৎ কবির মানস-লোকও তেমনি চাঞ্চল্য ও স্থিরতা সন্ধানী। কিন্তু সন্ধান করলেই কি মানুষ বিশ্বরূপের সঙ্গে এক আসনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে? নিত্যের সঙ্গে অনিত্যের গাঁটছড়া বাঁধা হতে পারে কিন্তু যা নিত্য থেকে যায়, অনিত্য ঝরে পড়ে—মানুষ তাঁর মন নিয়ে বিশ্বচিত্র থেকে ধুয়ে মুছে যায়। আবার অবশ্য অনুরূপ সন্ধান নিয়ে মানুষ আসে কিন্তু তাতেও বা কি? সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্র-আকাশ যেমন স্থির তেমন প্রথমের স্থিরতায় কি দ্বিতীয় সন্ধানীর আবির্ভাব হতে পারে মানব-জননীর গর্ভে? বিশ্বপ্রকৃতি যে ধাবমানতায় অস্থির তেমন ধাবমানতা নরদেহে কই? অতএব কবির বা যে-কোনো অবতারের (যিনি মানবদেহে অবতীর্ণ) বিশ্বরূপ-প্রাপ্তি ক্ষণকালের চেতনা-রাজ্যের বিষয়। 'আমি সূর্য্য'—বল্‌লেই কি সূর্য্য হওয়া যায়? সূর্য্যের ভাবে অনুরঞ্জিত করা যায় মাত্র চিত্ত। সেই ঝলমল-করা চিত্ত দেখে আমরা বিশ্বরূপভ্রমে পতিত হই। সৎ কবি যদি বিশ্বরূপ তাহলে তিনি যেমন ভ্রান্ত, তেমনি আমরা তাঁকে সে-আখ্যা দিয়ে ভ্রমে পতিত।

তার চাইতে বলা ভালো, সৎ কবি সৎ ব্যক্তি—মনকে তিনি আবৃত রাখতে নারাজ। বিশ্বপ্রকৃতি তাঁর ইন্দ্রিয়ের দ্বার-পথে মানসিক দ্বারকায় পৌঁছুতে পারলে যে কাণ্ডকীর্ত্তি-কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে দেয়—অহং-বোধে যে পৌরুষ জাগে তাঁর চেতনায় এবং শেষটায়

বিনয়-বোধে যে নম্রতায় শায়িত হয় তাঁর শরীর, তার রেখাপাত করে যাওয়াই সৎ ব্যক্তির স্বরূপ, সৎ কবির কাব্য। তিনি অভিনেতা নন—এটুকু জানলেই তাঁকে সৎ ভাবা যায়।

সমালোচক যদি কাব্য নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে উৎসুক হন তাহলে প্রথমত তাঁকে বিচার করতে হবে কাব্যের আন্তরিকতা। আমি রুশ-রণাঙ্গনে গিয়ে লড়াই করছি, একথা অনায়াসে ছন্দে গেঁথে বা চমৎকার বাক্য ব্যবহার করে বলে যেতে পারি; কিন্তু এ-বক্তব্যে কতোটা মানসিক সততা রক্ষিত বা নিবেদিত হল এ-বিষয়টি সমালোচককে পরিমাপ করে দেখতে হবে। 'আমি শ্রেণীহীন, আমি জাতির নামে বজ্জাতি দেখছি'—একথাটি কেউ বললেই যে সে আন্তরিক ভাব ব্যক্ত করছে তা না-ও হতে পারে। সততা ও শঠতা হাত ধরাধরি করে চলছে যেকালে, সেকালে ও দিনে বাক্যাবলীর পরিমাপ খুব সাবধানে করতে হয়। সমালোচকের পরীক্ষা-শক্তির প্রাচুর্য্য না থাকলে এ-কাজ সম্পন্ন হয় না। কবির অভিজ্ঞতার সদসৎ অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করবার ক্ষমতা না থাকলে আর যে কর্ম্মই হোক, কাব্য-সমালোচনার কর্ম্মটি হয় না। কবিতা পড়ে ভালো-লাগার ভাবটি হয়ত অনেক পাঠক লাভ করে থাকেন, কিন্তু তা থেকে এমন কথা বলা যায়না যে তেমন পাঠকই সৎ সমালোচক। সমালোচক ও পাঠক উভয়ে আত্মবোধই নিবেদন করেন সত্য কিন্তু নিবেদনের ভঙ্গীটি হয় পৃথক। এই পার্থক্য বিরাজিত থাকে বলেই একজন সমালোচক এবং অপরজন পাঠক। পাঠকের ভালো-লাগা কাঁচা আবেগের খাতিরে কিম্বা বুদ্ধিবৃত্তির কণ্ডুয়ন-চরিতার্থ হয় বলে। কিন্তু কাব্যগুণগ্রাহী সমালোচকের ভালো-লাগা সাহিত্য-শিল্পের একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব আলোরপথ সঞ্চার করে দিতে পারে। এমনও হয় যে কবি স্বয়ং সে আলোকপাত সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না তাঁর কাব্য-রচনা কালে। কবি যে তাঁর অভিজ্ঞতার সমস্ত অলিগলি আলোকিত দেখে একটি কবিতা সৃষ্টি করেন তা নয়। সৃষ্টির

পরও যে তিনি সেই বাক্‌বন্দী রচনাটির কারুকার্য্য সম্পর্কে সু-অবহিত হতে পারেন তা-ও নয়। বাক্ সামাজিক ; বাক্ চিত্র-প্রদায়ক ; চিত্র বিচিত্ররসদাতা। একটি বাক্‌বন্দী সৃষ্টি যে ক'টি রসচিত্র দিতে সমর্থ, তা স্রষ্টা কবির চাইতে অনেকস্থলে অবলোকন-কারী সমালোচকরা ভালো বলতে পারেন। যে-রচনা কবির মনঃপূত হচ্ছেনা, অনেকক্ষেত্রে সে-কবিতা কবিকে যশস্বী করেও তোলে, দেখা যায়। ধ্বনির স্বকীয় গুণের দরুণই তা হয়ে থাকে। তাই আমাদের মনে হয়, কবিতা ভাষান্তরিতা হতে পারেনা। ভাষান্তরিতা হয়ে যে-কবিতা কাব্যগুণ বজায় রাখে সে-কবিতায় কতকটা স্থায়ী ভাবরস আছে বলা যায়। কিন্তু ভাষা-শিল্পে ধ্বনি অবান্তর এবং স্থায়ী ভাব ও রসই সর্ব্বস্ব, তা তো নয়। গুণী কাব্যরসিকের চোখ আর কান সমান সজাগ থাকে। কাব্য দু'টি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গী হয়ে তবে অন্তরেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করে। চিত্র-গীতি চেতনায় যে রঙ ফলায় তা-ই কাব্যের আস্বাদিত রঙ।

তাহলে বল্‌তে হয় যে চোখ-কান থাকলেই কাব্যের চিক্কণ-রূপ-দর্শন হয়না—চাই চেতনার অচ্ছোদ-সরসী। সৎ কবি সম্ভবত এই মানস-সরসীর মালিক। সৎ সমালোচক মানস-যাত্রীর কষ্টটুকু স্বীকার করে তবে সেই তীর্থে উপনীত হতে পারেন। তখন সলিল জ্ঞানই তাঁকে বলে দেবে এ-সরসী সহৃদয়—ব্যূহ-গুহা-কুহক প্রভৃতি কিছুই নয়। কিন্তু মুস্কিল এই, চেতনার মুখোমুখি দাঁড়াতেই অনেকে শেখেননি—ফলে চোখ-কান-নির্ভর হয়ে স্বপ্নভঙ্গের হতাশায় বা কুহকের কুয়াশায় বসবাস করে যান। যেম্নি কবি, তেম্নি তাঁর পাঠক ও সমালোচক এই দুর্দ্দশা ভুগতে পারেন। সমালোচক যদি কবিতায় ভোজবাজি দেখতে সুরু করেন, তাহলে কবি 'হা হতোঽস্মি' না বলে আর কিছুই বলতে পারেন না।

চেতনায় ফলিত চিত্র স্বপ্নে বা মত্তাবস্থায় ভোজবাজি দেখায়—কিন্তু শিল্পীর এলাকায় যখন তা বিবেচিত হয় তখন পরা-বাস্তবতায়

তা সুসমন্বিত রূপ ধারণ করে। পরা বাস্তবতা অতীতে পলায়িত মানবিক বা মানসিক জীবন। সে-জীবন যে ম্যাজিসিয়ানের ম্যাজিকের মতোই কতকগুলো গুণবিধৃত বস্তু এ-জ্ঞান নিয়ে যদি আমরা কবির যাত্নর সম্মুখীন হই, তাহলে দেখতে পাবো মানুষের অতীত জীবন হতে আমাদেরই মতো কতকগুলো অনুভূতির ছবি কুড়িয়ে এনে কবি জোড়াতাড়া দিয়ে জীবন্ত করে তুলেছেন। কবির নিকট অতীতের একটি দেশের নাম নামমাত্রে পর্য্যবসিত নয়—সে-নামে সে-দেশ জীবন্ত তাঁর চিত্তে। এই জীবন্ততার কারকশক্তি ইতিহাস-চেতনা। মানুষের সুদীর্ঘ ইতিহাস যাঁর জানা নেই, তাঁর নিকট কবির অতীতাচরণ 'ম্যাজিক' বলে প্রতীত হতে পারে। কিন্তু যিনি অতীতচারী তাঁর দৃষ্টিতে পরা-বাস্তব-সেবী কবি অত্যন্ত বেশি মানব—প্রগাঢ় ব্যক্তিসত্তা।

কিন্তু কবিকে এ-আদর্শে জানা হয়ত আমাদের দেশের নবীন রীতি নয়। যদি তা-ই সত্য হয়, তাহলে অতি দ্রুত সে-রীতির সংস্কার দরকার। অর্থাৎ বিপ্লবী সমালোচকের দরকার, যদি দ্রুত-সংস্কারকে আমরা বিপ্লব আখ্যা দিই। অবশ্য বিপ্লবী সমালোচকের আবির্ভাবের আগেই বিপ্লবী কবির আবির্ভাব হচ্ছে বাংলায়, তা-ই জেনে আমরা সুখী।

॥ দুই ॥

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-বোধ সৌন্দর্য্য বা শ্রীতত্ত্বে নিহিত ছিল এবং সেই শ্রী হ'ল :

> "একটি রসময় রহস্যময় আয়ত্তের অতীত সত্য, আমাদের অন্তরেরই সঙ্গে তার অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ। তার সম্পর্কে আমাদের আত্মচেতনা হয় মধুর; গভীর, উজ্জ্বল। আমাদের ভিতরের মানুষ বেড়ে ওঠে, রাঙিয়ে ওঠে, রসিয়ে ওঠে।

আমাদের সত্তা যেন তার সঙ্গে রঙে রসে মিলে যায়—
একেই বলে অনুরাগ।” (অবতরণিকা—রবীন্দ্র রচনাবলী)

সৌন্দর্য্যানুরাগ কবির বা শিল্পীর মনের পুরণো কথা। সৌন্দর্য্যের সঙ্গে কল্যাণ এবং কুৎসিত, কুরূপের সঙ্গে অকল্যাণ মিতালি পাতায়, তা-ও ভারতীয় পুরাতন মানসিকতা। এই মানসিকতায় কবি-কৃতি রঞ্জিত করে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই বলেছিলেন উল্লেখিত উক্তির পর :

“কবির কাজ এই অনুরাগে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা, ঔদাসীন্য থেকে উদ্বোধিত করা।”

কবির সামাজিক প্রয়োজন এ-কথাটি থেকে অনুভব করে নেওয়া যায়। সৌন্দর্য্য ও তার সঙ্গী কল্যাণের অনুরাগে মানুষের চেতনার দর্পণটিকে দীপ্তিময় করতে পারলে জীবনের থেকে নানাবিধ ঔদাসীন্য দূরীভূত হবে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি ‘কবি-সত্যে’ উপনীত হয়েছিলেন যাকে প্রাচীন বাংলার নব্যন্যায়শাস্ত্রীরা ‘অনিত্য’-প্রত্যক্ষ বলতেন। এই চেতনার বিষয় নিত্যতায় উত্তীর্ণ হতে পারত ঈশ্বরতত্ত্বে উপনীত হলে। রবীন্দ্রনাথও নিত্যতা, মহিমা, মুক্তি, ব্যাপকতা ও গভীরতা সমন্বিত একটি দৈব আদর্শের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি ছিলেন।

এই অনুভব, বোধ বা অভিজ্ঞতা একটি সৌন্দর্য্যলিপ্সু মানসিকতা থেকে জন্ম নেয়। সুতরাং মনে করা যায় যে সেই মানসিকতায় কৌৎসিত্য-বোধও আছে। চিত্রশিল্পে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনের কৌৎসিত্য-বোধ ব্যক্তও করেছেন। কিন্তু কবি-কর্ম্মে তিনি কুৎসিত কুরূপের নিকট প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার প্রতি মনোযোগ বা অনুরাগ দেখান নি। রবীন্দ্রনাথের সংজ্ঞায় অনুরাগ হল ‘প্রায়-একাত্মকতা’। কিন্তু ‘অনুরাগ’ মানে অনুসরণলব্ধ রঙও হতে পারে এবং সে-রঙ একাত্মক হওয়ার লিপ্সা থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা হতেও পারে। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায়, বিশেষভাবে কল্লোলযুগের কবিদের

কাব্যানুভবে সৌন্দর্য্যলিপ্সু মানসিকতার সর্ব্বাঙ্গীণ রূপ দেখতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ থেকে তাঁরা এক-পদ অগ্রসর হয়ে গেছেন কুৎসিতকে সৌন্দর্য্যের পাশাপাশি স্থান করে দিয়ে। তাঁদের গৌরব ও বৈশিষ্ট্য জীবনের সামগ্রিক রূপবোধে।

কেউ-কেউ রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্যতত্ত্বে অসহিষ্ণু হয়ে এমন পংক্তিও সে-যুগে লিখেছেন ঃ

"সৌন্দর্য্যের পূজারী হইয়া জীবন কাটায় যারা
সত্যের শাঁস কালো বলে খাসা ম্লাঙা খোসা চোষে তারা।"
('মরুশিখা'—যতীন্দ্রনাথ)

কিন্তু এ-অসহিষ্ণুতা সৌন্দর্য্যতত্ত্বের অর্দ্ধাংশের প্রতি দৃষ্টিপাতের ফলে লাভ করে যতীন্দ্রনাথ পরবর্ত্তী যুগে অপরার্দ্ধে ঠিক এম্নি আসক্তি দেখিয়েছেন। তাঁর চাইতে কল্লোল-যুগের অপর কবিবৃন্দ অনেক বেশি প্রসারিত বৃত্তে সৌন্দর্য্যকে ও কৌৎসিত্যকে উপলব্ধি করেছেন। যেমন যুবমাশ্ব তাঁর 'শিলালিপি'-র এ-তিনটি পংক্তিতে নিবেদন করেছেন ঃ

"মানুষের বলিষ্ঠ বুকে
পুষ্ট মাংসপেশীতে
স্বপ্নময় নয়নে জেগেছিল কী আলোড়ন ! শুধু প্রেম ?"

কিম্বা প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর 'প্রথমা'-র 'নটরাজ'-এর দৃষ্টিতে বলেছেন ঃ

"কোন্ দেশেতে লাগল মড়ক, ভাগাড় আঁধার শকুন-ঝাঁকের মেঘে
আবার কোথায় হাঁস চড়ে ওই শ্যাওলা-দীঘির ঘাটে
ঝিউড়ি মেয়ে ঘস্‌তেছে পা খেজুড়-গুঁড়ির পাটে।"

অচিন্ত্যকুমার তাঁর 'অমাবস্যা-'র লিরিক লিখতে বলেছিলেন :

"জুঁই-জ্যোৎস্নায় ফুলের ফরাসে বিছানা বিছালো বিছা"

অজিত দত্ত 'দৈবদৈত্যে'-র সমাবেশ-চিত্রেব কঙ্কা এঁকে দেখিয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু 'বন্দীর বন্দনা'-য় 'প্রেমিক'-চিত্তের দৃষ্টিতে সেকালেই গোবিন্দচন্দ্র দাসের অথবা পিকাসোর দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেছেন :

"নতুন ননীর মতো তনু তব ? জানি, তার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে
কুৎসিত কঙ্কাল—
(ওগো কঙ্কাবতী)
মৃত-পীত বর্ণ তাব ; খড়ির মতন শাদা শুষ্ক অস্থিশ্রেণী—"

সুন্দর ও কুৎসিতের দাবী পৃথিবীব ও জীবনের উপর নিত্য সত্য—কার স্থিতি ও বিস্তৃতি কখন যে কতোটুকু হবে তার নিশ্চয়তা নেই। কবি যখন পৃথিবীর জীবন-বহির্ভূত জীব নন, তখন তাঁর অভিজ্ঞতার উপর এই উভয় দিকেবই দাবী আছে। তবে সে-দাবীব সদসৎ লক্ষণ চেতনার প্রবোচনায় যে-কবি সহজে উপলব্ধি করে তাদের চিত্র-কারুকর্ম্মে উদ্দীপ্ত হতে পারেন, তিনিই সার্ব্বকালীন কবি। কল্লোলযুগ থেকে এ-ধরনের সার্ব্বকালীন কবির প্রতিশ্রুতি নিয়ে অভিজ্ঞতার বিচিত্র পথ অতিক্রম করে গেছেন জীবনানন্দ দাশ। যেহেতু তাঁর রচনা তাঁর মৃত্যুতে সমাপ্ত হয়ে গেছে, তার জন্যে তাঁর সুদীর্ঘ কাব্য-সাধনার পরিমাপ করে এখন আমরা দেখতে পারি তাঁর 'বিশেষ অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস' থেকে বা তাঁরই দেওয়া কাব্য-সংজ্ঞা থেকে কোন্ রস প্রবাহিত। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের শ্রীতত্ত্বজাত মাধুর্য্যরস থেকে জীবনানন্দ কোনোকালেই নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে ভাবতে পারেন নি। অথচ রবীন্দ্রনাথ যে-পৃথিবী অথবা বাংলা

দেশের যে-শতক থেকে এই রস আহরণ করেছিলেন, সে-পৃথিবী জীবনানন্দের বোধে ছিল 'নষ্ট'। আরেকটি রসসমৃদ্ধ পৃথিবী যে নষ্ট পৃথিবীর স্থান অধিকার করেছিল এ-শতকে, তা-ও নয়। ফলে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা আর জীবনানন্দের অভিজ্ঞতা বাস্তব ক্ষেত্রে পৃথক হয়ে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আত্মচেতনায় 'মধুর, গভীর, উজ্জ্বল' অথচ আত্মচেতন বিংশ-শতকের বাঙালী কবি জীবনানন্দ গভীর হয়েছেন ঠিকই—হয়ত গভীরতরই হয়েছেন কিন্তু গভীরতর হবার দরুণই রবীন্দ্রনাথের মতো মাধুর্য্য-রসে উজ্জ্বল জাতক হয়ে উঠ্‌তে পারেন নি। অনুজ্জ্বলতা ও কঠোরতা বিশ শতকের জীবনের বিশেষ অভিজ্ঞতা ও চেতনালব্ধ ফল। জীবনানন্দের কাব্য এই দু'টি সম্প্রতি-লব্ধ গুণে গুণান্বিত।

অবশ্য এ-সব বিচার রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতীতির আদর্শ সামনে রেখে করা হচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেক কবিই তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্যে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করে কবিতায় সে সত্য প্রকাশ করে যান। প্রত্যেকেরই কাব্য সম্পর্কে এবং আপন সত্তা সম্পর্কে একটা প্রতীতি ও চিত্র আছে—দু'জন কবি কাব্যে বা সত্তায় এক হতে পারেন না। সমালোচনার ভিত্তি এই জ্ঞানে স্থাপন করলে বাঙালী কবির অভিজ্ঞতা-সমূহ ক্রমশই প্রকাশ্য হতে সুরু করবে।

কবিতার চরিত্র-প্রকাশ করাই সমালোচকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। চরিত্র বলতে প্রথমত বোঝাবে, প্রচলিত সত্য বা মিথ্যা যা-ই হোক, ভাবগত সাধারণ বুদ্ধিগ্রাহ্য রস। দ্বিতীয়ত, শ্রুতির ও পাঠের স্বাদ—ভাষা ও শব্দ ব্যবহারের প্রসঙ্গ এখানেই আসে এবং তৃতীয় প্রসঙ্গ ধ্বনিতত্ত্বে সমালোচককে প্রবেশ করতে হয়। এ-প্রসঙ্গে সমালোচক সাধারণত আপন সংস্কারগত ধ্বনি-চিত্রের পশ্চাদ্ধাবন করে ভ্রমে পতিত হন। কবিতার শব্দ-বহির্ভূত কোনো চিত্রে বা সুরে চলে যাওয়া হয়ত আত্মরতি। তেমনি কবিতায় ব্যঞ্জিত কোনো শব্দের সূক্ষ্ম চিত্র বা সুর উপেক্ষা করাও অনুচিত কর্ম্ম।

আমরা এ-স্থলে উক্ত বিষয়গুলো পরীক্ষার জন্যে জীবনানন্দ দাশের একটি উপেক্ষিতা কবিতা গ্রহণ করছি :

ফিরে এসো

ফিরে এসো সমুদ্রের ধারে
ফিরে এসো প্রান্তরের পথে ;
যেইখানে ট্রেন এসে থামে
আম নিম ঝাউয়ের জগতে
ফিরে এসো ; একদিন নীল ডিম করেছ বুনন ;
আজো তারা শিশিরে নীরব ;
পাখির ঝর্ণা হয়ে কবে
আমারে করিবে অনুভব !—(মহাপৃথিবী)

গৌড়ীয় বৈষ্ণবতায় যদি সমালোচকের মন নিবিষ্ট থাকে, তাহলে তিনি এ-কবিতাটিকে উৎকৃষ্ট চিত্তের 'প্রেম-রস নিবেদন' মূলক রচনা বলতে বাধ্য হবেন। অন্তত তার চাইতে সাধারণ-বোধ্য অন্য কোনো রস প্রথম-পাঠে কবিতাটি থেকে তাঁর পক্ষে আহরণ করা মুস্কিল। বলা বাহুল্য যে পেম-নিবেদন জীবনশক্তিকে। রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদীয় মানসিকতা থেকে এখানেই জীবনানন্দ স্পষ্টত বিদায় গ্রহণ করলেন।

সমালোচক যদি বাঙালীর ঐতিহ্য উপেক্ষা করে বিলিতি ঢঙে কবিতাটির রস উপলব্ধি করতে চান, তাহলে 'মনোভঙ্গী'র প্রশ্ন আসবে। এখানে কবিব 'মনোভঙ্গী' করুণ রস নিবেদন করছে— অর্থাৎ এখানে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'যৌবনবেদনা রস'-এর আভাস আছে বলে উপলব্ধি হবে। অবশ্য তা-ও নিঃসঙ্গ বিরহী প্রেমিক চিত্তেরই রস।

ছন্দ প্রসঙ্গে বলুব যে বাংলা প্রবহমান পয়ারেব পদের একটি পংক্তি এ-রচনায় মাত্রিক ধ্বনিতে প্রসারিত করে নিতে হবে। 'ঝর্ণা'

শব্দটিকে দু'-মাত্রায় রাখা যাবে না। কেন রাখলেন না কবি এ-কথাটিকে পয়ারে প্রচলিত ধ্বনিমাত্রার গম্ভীর বন্ধনে? যেহেতু, তিনি এ-শব্দটির উপর ঝোঁক দিতে চান অথচ পয়ারে বা প্রাচীন পদ্ধতিতে প্রচলিত 'ঝরণা' লিপিটি পছন্দ করে ধ্বনিমাত্রার বিস্তার দেখাতেও অনিচ্ছুক। প্রাচীনতাকে বর্জ্জনের ইচ্ছা ছন্দে ও লিপিতে পর্য্যন্ত ধাবিত! কিন্তু ভাষা ব্যবহারে তিনি এখানেও বঙ্গীয় পদ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। ক্রিয়াপদ কোথাও কথ্যভাষা অনুযায়ী, কোথাও বা সাধুভাষা অনুগামী হয়েছে। অবশ্য অচিরেই তিনি স্বকীয় কাব্য-ভাষা-রীতি তৈরী করে আগামী দিনের কাব্যা-চারীদের ব্যবহারের জন্যে রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু এখানে তিনি অস্থিব।

ধ্বনিতত্ত্বে প্রবিষ্ট চিত্ত এই অষ্টকটি বা আট পংক্তি থেকে যে-যে ধ্বনিচিত্র লাভ করবে, কাব্যের বিশিষ্টতা বর্ণন তার উপর অনেকটা নির্ভর করে। ধ্বনিবাদী প্রথমেই জিজ্ঞাসা করবেন: কবি-প্রাণ কাকে আহ্বান করছেন? 'পাখির ঝর্ণা' হতে কাকে অনুরোধ জানাচ্ছেন? কোনো সৃষ্টিশীলা নারীর না বহু-নারীর মূর্ত্তি পাখীর ঝাঁক হয়ে এই কবি-পুরুষকে আদি সৃষ্টিস্বপ্ন দেখাচ্ছে? আলঙ্কারি-করা এখানকার 'নীল ডিম' থেকে সুরু করে 'পাখীর ঝর্ণা' পর্য্যন্ত বিস্তৃত ধ্বনিচিত্রে নায়িকাকে 'সমাসোক্তি' ও 'সঙ্করালঙ্কার'-এ মুড়িয়ে চিনতে চাইবেন। একটা নীল ডিম ফেটে যেমন পাখী হয়, একটি শিশিরবিন্দু যেমন ঝর্ণার ছবি মনে এনে দিতে পারে—জড়, শীতার্ত্ত বস্তু যেমন উষ্ণতায় প্রাণময় হয়, এ-ধ্বনিচিত্রের নায়িকা তেমনই হতে পারেন নায়ক কবি-পুরুষের উষ্ণতার সান্নিধ্যে এসে। কিন্তু এই অবলোকনে ভারতীয় ধ্বনিতত্ত্ব স্থির বসে নেই। 'ব্যঙ্গ'-ধ্বনি এ-পংক্তিগুলোতে কী আছে—কাব্য-চেতন ব্যক্তি তা ভাবতে থাকবেন। শব্দার্থ যা-ই বলুক তা ছাড়া একটি ভাব-ব্যঞ্জনা ধ্বনিময়ী পংক্তি-গুলোতে আবিষ্কার করতে চাইবেন, যা স্থান-কাল-বিশেষিত কোনো

জ্ঞানে বিধৃত নয়। আবহমান কাল ধাবিত নর-নারীর বিরহী সত্তার মিলনেচ্ছা যে পরিবেশে অবাধ ছিল, ধ্বনিসূরী কবিচিত্তকে সে-পরিবেশে বিচরণশীল দেখবেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবতা যদি সে-যুগ আহ্বান করেছিল বলে ধ্বনিবাদীর প্রতীতি থাকে, যদি তিনি তখন-কার সৎ ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন থেকে বলেন যে কবিচিত্তের এই পুনরাহ্বানে সে-যুগের কারো কণ্ঠ ও চেতনার সুর তিনি শুনতে পাচ্ছেন, তাহলে তাঁর মানসিক চিত্র সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে কলহ করা যায় না। কবিতা কিন্তু এমন মানসিক চিত্র দিতে পারে বলেই 'মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত' করে থাকে। অবশ্য বিলিতি কাব্যের সমালোচকরা হাত বাড়িয়ে এসব চিত্র ধরতে পারলেও বলে থাকেন, আত্মরতি বা দুর্গমতায় তাঁরা হাত বাড়ালেন। কবিমনের সিঁড়ি তাঁদের স্বর্গের সিঁড়ি না হলে যেন সহজ নয়!

'ফিরে এসো' কবিতার অন্তর্গত নিঃসঙ্গতার আর্ত্তরব ও নির্জ্জনতা-পিপাসা কাব্যসূরীকে যতোটা সৎ বোধে উদ্বোধিত করবে তেমন আর কাউকে করবে না –প্রেমিক চিত্তকেও না। প্রেমিক চিত্ত যদি অচৈতন্য অবস্থায় থাকে তাহলে এ-পংক্তিগুলো তাতে কামাতুর বেদনা ভিন্ন কোনো রস ফলিত বা ফেনায়িত করে তুলবে না। বাঙালীর বিদগ্ধতা অচৈতন্যে নয়, চৈতন্যে ও চেতনাদানে।

রবীন্দ্রোত্তর কবিতা

॥ এক ॥

'রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য' কথাটি বাংলাদেশের সংস্কারাচ্ছন্ন সাহিত্যিকের মনে হয়ত বিভীষিকার জন্ম দেয়। অথচ মোটেই তা ভয় পাবার মতো কথা নয়। রবীন্দ্র-সাহিত্য বিরাট। বিরাট হলেও তার আরম্ভ ও শেষ উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং বস্তু বা পদার্থের নিয়মে তা অনিত্য। আপন সাহিত্যের অনিত্যতার উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষদিককার কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। সর্ব্বত্রগামী কবিতা রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে আবিষ্কার করা যাবে না। রবীন্দ্রোত্তর রচনা থেকে তা আবিষ্কার করা সম্ভবপর।

রবীন্দ্রোত্তর কথাটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পাঠক-সম্প্রদায়ে হয়ত আলোচিত হত। করুণানিধান, কিরণধন, অপরাজিতা দেবী এবং মোহিতলালের কবিতা তখন যাঁরা পড়তেন, তাঁরা পারস্য ও ঘরোয়া পরিবেশের একটি আনন্দময় আমেজ নিশ্চয়ই উপভোগ করেছেন। তদানীন্তন রবীন্দ্রনাথে এ-আমেজ বা সত্যেন্দ্র দত্তের বাক্‌ছন্দ নিয়ে কারুকৌশললীলা উপলব্ধি করতে কেউ সমর্থ ছিলেন কিনা সন্দেহ। তারপর বীররস বা রাষ্ট্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ প্রমত্ত রস মোহিতলাল পরিবেষণ করেছেন যখন নজরুল সৈনিক-কবি হিসেবে পদ-ছন্দের কুচকাওয়াজ দেখাচ্ছিলেন তুর্কী রণাঙ্গনে বসে। অসহযোগ আন্দোলনের কবি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। সে-কালেও রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই ছিলেন তাঁর কাব্য-সাধনায়। রাষ্ট্রিক বাস্তববাদের অধ্যায় তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কালেই সমাপ্ত করে কলকাতা ত্যাগ করেন। অসহযোগ আন্দোলনে তা-ই কলকাতার কবিতা আমরা সত্যেন দত্তের রচনাতেই দেখতে পেয়েছি এবং তাঁর পর নজরুল ইসলামের কবিতায়।

অসহযোগ আন্দোলনের ধাক্কা বাঙালীর চেতনায় দুটি বোধের জন্ম দিয়েছিল। অহিংস বোধে বৈষ্ণবতা, বিনয় ও সহিষ্ণুতার প্রাক্তন তরঙ্গে বাংলার কবিদের চিত্তে জাগ্রত হ'ল একটি হারানো দিনের ব্যথিত সুর—তা-ও হয়ত একদা রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহ ঠাকুর সেজে বাঙালী পাঠকের মৈথিলী চিত্তের নিকট উপস্থিত করেছিলেন। কিন্তু হিংস্র বোধে যে বিদ্রোহী ভাবের জন্ম দিল অসহযোগ আন্দোলন বিদ্রোহী বাঙালীর প্রাক্তন চিত্তে তার ধ্বনি-তরঙ্গ প্রথম শুনতে সমর্থ হলেন নজরুল ইসলাম। মোহিতলাল 'নাদির শাহর জাগরণ' কবিতায় যে কামনা ব্যক্ত করেছিলেন, নবীনচন্দ্র "দাঁড়ারে যবন—" বলে যে আহ্বান জানিয়ে গিয়েছিলেন তার যথার্থ কাব্যমূর্ত্তি দিতে পারল নজরুলের বাক্‌চিত্র 'বিদ্রোহী' কবিতা।

'বিদ্রোহী' কবিতা হয়েছিল—চারণগীতি নয়। 'তন্বী নয়নে বহ্নি' হবার কামনাতে কবি আপন জাতিত্বের ও ব্যক্তিত্বের উর্ধ্বে চলে গিয়ে কবিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বীররসে সঞ্জীবিত করে। এমন কবিতা বাংলা সাহিত্যে ছিল না। আর এমন কবিতা লিখতে পেরেছিলেন বলেই নজরুল রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। বঙ্গজননীর নানা সত্তায় নানা সন্তানের যে প্রতিকৃতি তার নাম হিংস্র, অহিংস কোনো জীব নয়—তার নাম 'বিদ্রোহী'। অন্তত অসহযোগের আমল পর্য্যন্ত তাই ছিল বাঙালীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু কবির 'বিদ্রোহ' যে ক্ষণস্থায়ী তার প্রমাণ প্রত্যেক যুগের বাঙালী কবিই তাঁদের রচনায় রেখে গেছেন। নজরুলের 'অগ্নিবীণা'-ও তাই 'দোলনচাঁপা'য় পরিণতির বিশ্রাম খুঁজে 'বিষের বাঁশী'তে বিসর্পিত হ'ল। নজরুলের তরঙ্গিত সত্তার স্পর্শ পেয়েছিলেন কল্লোলের কবি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর 'ঝরা-পালক' গ্রন্থের একাধিক কবিতায় তিনি নজরুলের অনুসরণ-স্বাক্ষর রেখেছেন।

অপর দিকে কাব্যে যে পারস্য উপাখ্যান তৈরী করে তুলেছিলেন মোহিতলাল তা সত্যেন্দ্রনাথের বৈদিক পারস্যতার

সারস্বত অধ্যায় নয়। পহ্লবী অধ্যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র সে-অধ্যায়ে আকৃষ্ট কবি।

গান্ধীবাদে যে সুদৃঢ় বৈষ্ণবতা ছিল, তাতে আকৃষ্ট ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথও তাতে অনাকৃষ্ট ছিলেন তা বলা যায় না। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের এই জাগরণ 'নারায়ণ'-এর কবি চিত্তরঞ্জন দাশের রাষ্ট্রিক জাগরণের সমসাময়িক। কিন্তু রাষ্ট্রিক চেতনায় যে-কালে সত্যেন্দ্রনাথ রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার চারণ-কবি হয়ে উঠলেন সে-কালে বৈষ্ণব কবিতা শুনতে পেলাম কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস রায়ের লেখনী থেকে। জানিনে, চিত্তরঞ্জনের অকালবিয়োগ-ব্যথা থেকে জাগ্রত কিনা তাঁদের কাব্য-প্রেরণা। সে বিয়োগ-ব্যথা বাঙালীর প্রথম জাতীয় বিয়োগ-ব্যথা। রবীন্দ্রনাথের এবং নজরুলের কয়েকটি পদ্য পংক্তি এই বিয়োগকে বাঙালীর চিত্তে বহুদিন অনুরণিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় সভ্যতা-চর্য্যায়, রবিকক্ষের জ্যোতিষ্কমাত্রেই অনুরঞ্জিত ছিলেন। পারস্য বা তুর্কী চর্য্যা ছিল খানিকটা মোহাত্মক তির্য্যকতা। কিন্তু বাঙালীকে তার জরাজীর্ণ ইতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠ করতে চেয়েছিলেন প্রথম যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মরুচর্য্যাদ্বারা। কাব্য-চর্চা বহুকাল চলে এসেছিল ভারতের নানা ধারার ধর্ম্ম ও প্রচলিত সাহিত্য থেকে উপকরণ ও মতামত সংগ্রহ করে এবং ইংরেজী কাব্য-ধারার প্রকৃতিবাদী কবিসমূহের মনোভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে। বাঙালীর নিজস্ব জীবনের থেকে মহাকাব্য তৈরী করেছিলেন হেমচন্দ্রের ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র এবং 'পলাশীর যুদ্ধ' রচয়িতা নবীনচন্দ্র। কিন্তু গার্হস্থ্য বা রাষ্ট্রিক জীবনের আলেখ্যই সেসব মহাকাব্যের বর্ণনীয় বস্তু ছিল, ছিলনা বাঙালীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের সুর যা তাদের গোষ্ঠীজীবন থেকে ধারাবাহিক স্রোতে আজ পর্য্যন্ত বাঙালী মাত্রকেই বহন করতে হচ্ছে। যতীন্দ্রনাথ সেই সুর শুনিয়েছিলেন তাঁর কবিতাপুস্তকগুলোতে—যে সুর জাতির বার্দ্ধক্যের। ভাঙা

হাটের গান কিংবা তেমন মাটির গান যা আজ মরুভূমি। এই বার্দ্ধক্য জীবনানন্দেও সঞ্চারিত হয়েছিল।

বাঙালী অতি প্রাচীন জাতি। জরাজীর্ণতা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তবু ধ্বংসকামিতার পেছনে যে বাঙালীর অতি ধূসর, অতি কুয়াশাময় জীবনের ছন্দে একটা কাতর ধ্বনি শ্রুত হয় তা অতি সহজভাবে যতীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি কবিতায় (অন্তত ১৯৪১ পর্য্যন্ত) ব্যঞ্জিত হয়েছিল। এই ব্যর্থতা-বোধ প্রাচীন। বাঙালী জাতির সূচনায় কোনো মরু অঞ্চলে জাত।

ব্যর্থতার চিত্র রবীন্দ্রনাথেব সার্থকতা-উপলব্ধির বিপবীতধর্ম্মী। এই বিপরীতধর্ম্ম তান্ত্রিক মোহিতলাল তাঁর 'কালাপাহাড়' কবিতায় প্রতি পংক্তিতেই যথেষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

কার পথে-পথে গিরি নুয়ে যায়, কটাক্ষে রবি অস্তমান
খড়্গ কাহার থির-বিদ্যুৎ, ধূলিধ্বজা কার মেঘ সমান।
ভয় পায় ভয়, ভগবান ভাগে, প্রেতপুরী বুঝি হয় সাবাড়
ওই আসে, ওই বাজে দুন্দুভি—বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়
—কালাপাহাড়।

যতীন্দ্রনাথ 'ধূমাবতী' চিত্রে ধ্বংস-ছবিটির উল্লাস রটাননি—তান্ত্রিকতার অভিশাপবিদ্যা প্রকাশ করেছেন। বিদ্রোহ বা বিপ্লব দেখবার দৃষ্টি তাঁব 'কুয়াসা'র ধূমাবতীতে নেই। পঞ্চাশেব মন্বন্তরের আগেই কবি যৌগিক অন্তদৃষ্টির বলে বলে' উঠলেন ঃ

একা চাকাভাঙা কাককেতু রথে
ভ্রমে ধূমাবতী বুভুক্ষা পথে
বুঝেছ ?

গগনবিহারী সে-কাককণ্ঠে
হে কবি তোমার
কোকিল-কূজন কূজেছ ?

সজনীকান্তও তাঁর 'অগ্নিদূত' কবিতায় এই ভঙ্গী প্রকাশ করেছিলেন ! তবে তা মোহাচ্ছন্নতা :

নীলিমা ধূসর, পাণ্ডু সবুজ
দিবসে গভীর রাতি
রৌদ্র রচিছে বিজন নিশীথ মোহ ;
কাকেরা জাগিছে আর্ত্তকণ্ঠে
জ্বালায়ে দিনের বাতি
চন্দ্রালুপ্ত দিবসের সমারোহ ।

অভাব-বোধ থেকেই এই নৈরাশ্য, কিন্তু যতীন্দ্রনাথের নৈরাশ্য নিয়তির মতো দুর্ব্বার। সে-নৈরাশ্যের পেয়ালায় শুধু জীবনানন্দই চুমুক দেননি, অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেব বসুও চুমুক দিয়েছেন।

নজরুল যে নৈরাশ্য অনুভব করেছিলেন 'দোলন চাঁপা'র কালে তার পেছনে ছিল প্রেম-কাতর চিত্ত। এই প্রেম-কাতরতা 'কল্লোল' ও 'প্রগতি'র কবিদের মানসিক গতিপথ প্রচুরভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাছাড়া 'প্রবাসী'র কবি সুধীরকুমার চৌধুরীও এম্নি একটি কাতরতার ধ্বনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন যে ধ্বনি আত্মবিচ্ছেদ থেকে উত্থিত। শৈশব ও কৈশোর কাল থেকে বিচ্ছিন্ন যৌবনও যে ক্রন্দনরব শোনাতে পারে তা আমরা তাঁর 'পথধূলি' কবিতা পড়ে জানলাম।

কিন্তু যাকে যৌবনোচিত ধর্ম্ম বলা যায়—নরনারীর মোহাত্মক প্রেমবৃত্তি যখন মানুষমাত্রকেই চঞ্চল করে তোলে, সেই যৌবনের সোচ্চার জয়গান আমরা পণ্ডিচেরীর সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কবিতায়

পাঠ করেছি। রবীন্দ্রোত্তর কাব্যের সবচাইতে উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই ধরনের কবিতায়। তখনই আমরা পাই সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর 'মনের মাধুরী' কবিতার দর্পণে বা 'তনুদেহ' কবিতার ভাণ্ডে। সংস্কৃত কবি রাজশেখর ষোড়শীতনু বর্ণনায় যে রতিভাব পরিস্ফুট করেছিলেন, সুরেশচন্দ্র তাঁর 'বসনখানি শাসন কর অয়ি···' কবিতায় অনুরূপ ভাবজাত রস নিবেদন করেছেন। হেমচন্দ্র বাগচী এবং যুবনাশ্বও তনুপ্রেমবাদী কবি। অচিন্ত্যকুমার তাঁর গোড়াব দিককার কবিতায় তা-ই।

তবে 'প্রগতি'র সম্পাদকদ্বয় দেহজ প্রেমে যথেষ্ট পরিমাণে স্বপ্নের রঙ মেশাতে সমর্থ হয়েছেন। উদাহরণত 'মালতী ঘুমায়' ও 'কঙ্কাবতী' কবিতাদ্বয়ে আমরা অজিত দত্তের ও বুদ্ধদেব বসুর 'উর্বশী'-কে দেখতে পাই—যে উর্বশী দেবসভা থেকে স্বাভাবিকভাবে ভূমিতে প্রক্ষিপ্তা।

জীবনানন্দের প্রেম বা অপ্রেম শরীরজ। শরীর মানে শরবিদ্ধ বস্তু। সে শর পঞ্চশরের তো বটেই তাছাড়া বিবেকনাদী শরও ছিল তাতে আলো-অন্ধকারে তৈরী। গ্রীক নাটকের কোরাস-এর বিভীষিকা যদি যতীন্দ্রনাথ দেখিয়ে থাকেন, তাহলে বলতে হয় যে ভরত-নাট্যের কু-সু চিন্তা জীবনানন্দের মনে সক্রিয় ছিল।

দেহজ প্রেম যখন একবার নগ্নতায় প্রকাশিত হয়ে কাব্যাস্বাদ দিতে সমর্থ হয় তখন তার ধ্বনি-তরঙ্গ বিচিত্র হলেও দীর্ঘকাল ব্যাপী সুর শোনাতে সুরু করে। রবীন্দ্রনাথ এই দেহবাদে যে আচ্ছাদন পরিয়েছিলেন, তেমন আচ্ছাদন যে সম্পূর্ণত বাতিল হয়ে গেল তা নয়—বহু কবি সে আচ্ছাদনই কাম্য মনে করেছেন। তাঁদের যথার্থত রবীন্দ্রোত্তর কবি বলা যায়না।

॥ দুই ॥

রবীন্দ্রোত্তর কবি যদি সখ্য রসে নির্ণীত করতে হয় তাহলে বরদাচরণ মিত্রকে স্মরণ করতে হবে যিনি উনিশশতকের দেহজ প্রেম-

রসাপ্লুত কাব্যধারার উত্তরসাধক। দ্বিজেন্দ্রলালও এ-পথে গেছেন এবং গোবিন্দদাসে তার উত্তম বিকাশ হয়েছে। গোবিন্দ দাসের এসব পংক্তি এ-ধারার কাব্য-বিচারে অবিস্মরণীয় ঃ

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ
আমি ও নারীর রূপে
আমি ও মাংসের স্তূপে
কামনার কমনীয় কেলি কালীদহ
ও কর্দমে—অই পঙ্কে
অই ক্লেদে—ও কলঙ্কে
কালীয় নাগের মত সুখী অহরহ
আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ।

বৈদিক দৃষ্টিতে এ-কবিকে বৃত্রাসুর বলব এবং সে-বিদগ্ধদৃষ্টির চক্ষু ছিল রবীন্দ্রনাথের এবং সত্যেন্দ্রনাথের। এ-নগ্নতার উপর খানিকটা আবরণ দেওয়া চলে দু'ধারায়। স্বপ্নের কুয়াশায় বা গ্রীসীয় অতীন্দ্রিয়তায়। স্বপ্নের ধারায় বরদাচরণ থেকে চিত্তরঞ্জন এবং কয়েকজন মহিলা-কবিকে আবিষ্কার করতে পারি আমরা কিন্তু স্বপ্ন নামক বস্তুকে ভক্তিবাদে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। স্বপ্নকে খাঁটি সত্তায় ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরী এবং বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর তাকে অপ্সর বা উর্বশীর রাজ্যে যাঁরা গ্রীসীয় ভঙ্গীতে নিয়ে গেছেন তাঁরা বৈদিক কবি রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্র-নাথ, সতীশচন্দ্র রায়, শশাঙ্ক সেন, কামিনী রায় প্রভৃতি। তৃতীয় পথটি ছিল সুফীবাদের পথ। করুণানিধান, যতীন্দ্র বাগচী, নরেন্দ্র দেব প্রভৃতিকে সে-পথে চলতে দেখা যায়। সে-পথ থেকে মোহিতলাল রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের প্রথম দামামা বাজালেন। এ-বাদ্য সচেতনতায় ভরপুর, নজরুলের মতো বানভাসী চিত্তের দান

এ নয়। মোহিতলাল রবীন্দ্রোত্তর কাব্যের প্রথম হোতা—যেন যোগী বশিষ্ঠের বদলে তান্ত্রিক বিশ্বামিত্র।

মোহিতলাল 'স্বপন-পসারী'র বাল্যলীলা শেষ করে পারস্য বাগিচা থেকে সেলিমের মতো যে নূরজাহান নিয়ে বেরিয়ে এলেন তা শাক্ততন্ত্র—মৃত্যুঞ্জয়ী ওষধি। স্ববগরলকে বিস্মরণে ফেলে তিনি গৃহাগ্নি জ্বেলে দিতে চাইলেন তারপর। গৃহে গৃহে সে অগ্নি সত্যি জ্বলে উঠল। প্রেমেন্দ্র মিত্রকে পেলাম আমরা আর পেলাম যুবনাশ্বের মতো এক তুরঙ্গম-শক্তি। প্রেমকৃতি স্মরণ করিয়ে ক্রতোস্মর মন্ত্রে যৌবন-শক্তিকে শান্ত সমাহিত ভঙ্গীতে নিয়ে আসবার চর্য্যা দেখিয়েছেন মোহিতলাল যার ফলে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সুসংসহ এবং যুবনাশ্বের সংযত প্রেমের কবিতাগুলো আমরা উপভোগ করতে পেরেছি। মোহিতলাল যতীন্দ্রনাথের মতো সুরুতেই জরাগ্রস্ত নন, নজরুলের মতো প্রথম মহাযুদ্ধের সেনা-উন্মাদনায় মত্ত নন—তিনি ভেবেচিন্তে 'কালাপাহাড়'। তারপর 'নচিকেতা'। যেমি গ্রীসীয় প্রমেথিয়ুস ঠিক তেমি কিন্তু ভারতীয় 'নচিকেতা' নন, যদিও দু'জনই অগ্নির অমৃতসত্তাজ্ঞানদাতা। প্রমেথিয়ুস চোর আর নচিকেতা দুঃসাহসিক প্রার্থী। কিন্তু বাঙালী কাব্য-পাঠকের হাত থেকে মোহিতলাল সম্ভবত প্রমেথিয়ুসের শাস্তিই পেয়েছেন। প্রমেথিয়ুসের মতোই যেন রবীন্দ্রনাথকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে তিনি বলতে চেয়েছেন তাই : "Part of my sorrow is the pain of him."

এ-শাস্তি হৃদয়কে রিক্ত করবার শাস্তি। শক্তিমদ মানুষের যৌবনকে হতশ্রী করে না তুলতে পারে কিন্তু প্রৌঢ়চিন্তাকে অনুশোচনায় ভরিয়ে তোলে। এই মনস্তত্ত্ব ঠিক ভবভূতির মতো প্রকাশ করেছিলেন মোহিতলাল 'চৈত্র-রাতে' কবিতায় :

আসিয়াছে চৈত্র-রাতি, সাথে তার জ্যোৎস্না-যাদুকরী
স্বপ্ন আছে, নিদ্রা নাই ! যৌবনের সেই রূপকথা

চমকিয়া স্মরি শুধু, চমকিয়া উঠে পান্থ যথা
মৃদুগন্ধে দূর বনে ফোটে বুঝি নেবুর মঞ্জরী !

ভবভূতির 'শিলা-ভট্টারিকা'র আমেজ-লাগা পংক্তি। এ-আমেজের পংক্তি কালিদাস রায়ে এবং অজিত দত্তে ক্ষয়িত যৌবনের শোক-গাথায় আছে। কিন্তু এ-শোক রবীন্দ্রনাথকে কোনোদিন করতে হয়নি। রবীন্দ্রোত্তর কাব্যকলার প্রথম তরঙ্গের উপর বিজয়ী রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখতে পেয়েছি। এ-শতকের বিশের সনগুলোর ফল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথের মূর্তিকেই বাঙালী কাব্য-পাঠকের সম্মুখীন করে দিয়েছে।

তবু যাঁরা রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বেচ্ছায় নিজেদের পৃথক করে আত্মপরীক্ষা দিতে অগ্রসর হয়েছেন—মোহিতলাল, পরিণত নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ—তাঁদের বৈশিষ্ট্য আদ্যোপান্ত তাঁরা বজায় রেখে গেছেন। নজরুল আজ বোধহারা কিন্তু তাঁর এ-বোধ আজও আমরা 'চৈতী হাওয়া'য় সকৃতজ্ঞ অন্তরে বহন করি :

হারিয়ে গেছ অন্ধকারে—পাইনি খুঁজে আর
আজকে তোমার আমার মাঝে সপ্ত পারাবার
আজকে তোমার জন্মদিন
স্মরণ বেলায় নিদ্রাহীন
হাতড়ে ফিরি হারিয়ে যাওয়ার অকূল অন্ধকার !
এই-সে-হেথাই হারিয়ে গেছ কুড়িয়ে পাওয়া ভার !

জরাগ্রস্ত বাঙালীর চিন্তাজ্বর প্রেমচিত্ততার যে কতোটুকু ক্ষয়কারী ব্যাধি তা যতীন্দ্রনাথের কাব্য-চিত্রে দেখতে পাব আমরা। 'মালবিকা-অগ্নিমিত্র' কাহিনীকার বাস্তব কালিদাসকে পাওয়া

যায় যতীন্দ্রনাথের মনোভঙ্গীতে, যিনি প্রেম-চিত্তের বিশ্লেষণে এমন কুটিল :

> অনাতুরেণোৎকণ্ঠিতয়ো প্রসিদ্ধতা
> সমাগমেনাপি রতি ন মাং প্রতি।

সুতরাং নির্ব্বাসিত যক্ষের অপর-পৃষ্ঠা যতীন্দ্রনাথ বলছেন :

> অপরিচয়েরবিস্মৃতি পার
> কর অতিবল্লভারে আমার
> ঘন নালবাসে নবীন বিরহে
> দুর্ল্লভতর হে।

রতিভুঞ্জনে পরিক্লিষ্ট দেহের প্রতি যে বিদ্রূপ উদ্যত করে গেছেন যতীন্দ্রনাথ তা আমাদের মনে ফরাসী কবি মালার্মেকে স্মরণ করায়। তাঁর 'রূপ কোথা আছে' কবিতার মন মালার্মের ক্লেদাক্ত মেদিনীকে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি দেখে বলছে :

> আকাশের নীলে
> ক্ষুধাতুর লুব্ধ শ্যেন লুকাইল
> রূপসীর সুডোল কপোলে
> ক্ষুদ্র কৃষ্ণ তিলে।

যে-দাহ মোহিতলালে ছিল, সে-দাহ যতীন্দ্রনাথের মরুচিত্তে কোনো বোধই দিতে পারেনি শেষ পর্য্যন্ত। এ-কঠোরতা কাব্যের দিগ্দর্শনের দৃষ্টিতে নমস্য কিন্তু জীবনায়নের দিক থেকে এই বীররস পরিত্যজ্য। যতীন্দ্রনাথের মনের শরিক হওয়া না হওয়ার প্রশ্ন না তুলেই আমরা বলব যে এ-কঠোরতা অশীল। মনোবিকারের

জন্মদাতা যেমন অশ্লীলতা, অশীল কঠোরতা, শিলার কাঠিন্য তেমনই মানসিক স্বাস্থ্যের হানি ঘটায় এবং কবিকে ধীরে ধীরে আপন শিলাদুর্গে বন্দী করে ফেলে।

॥ তিন ॥

এই যখন বাংলা কবিতার মনন-ক্ষেত্রের অবস্থা তখন কৃষ্ণপ্রেমে ধাবিত হওয়া ছাড়া বহু কবিরই আর গত্যন্তর ছিলনা। তবে প্রমথ বিশী কিঞ্চিৎ চার্ব্বাক-দর্শন মুড়ে নটী বসন্তসেনার নিরাপদ রস আমাদের সে যুগে দিয়েছেন একথা ধ্রুব জেনে যে বসন্তসেনার মতো কেউ কোনো দরিদ্র চারুদত্ত-গৃহে সম্প্রতি আসবে না। সজনীকান্তও সে-যুগে মরু-চেতনা মনে মনে বহন করেছেন 'বিলাম্বিনী' কবিতায় আর আশ্চর্য্যভাবে হুমায়ুন কবির ব্রজভাবাপন্ন কবিতায় মনোনিবেশ করেছিলেন। তবু সবই যেন আগে-শোনা ধ্বনি—ক্লান্তি আর বাঁচবার সকরুণ প্রয়াস-চিত্র নিয়ে এ-ধরনের কবিতা বয়ে চলেছিল সাহিত্যের পৃষ্ঠে।

কল্লোল-প্রগতি-কালিকলমের জীবন্ততা, জ্ঞান, সাময়িকতা-বোধ এ-ধারায় মোটেও খুঁজে পাওয়া যাবেনা, যাবে বরং অন্নদাশঙ্করে এবং অমিয় চক্রবর্ত্তীতে খানিকটা। সাম্প্রতিক মানবীকে চোখের উপর স্থির রেখে তার গায়ে সারস্বতের মণ্ডন ও অলঙ্করণ দেওয়ার কাজে পাশ্চাত্ত্য কবিতা যে অপূর্ব্ব সিদ্ধি লাভ করেছিল—এই দু'জন কবি কল্লোলোত্তর যুগে তেমন সাধনা করেছেন, যা কল্লোল-প্রগতির অনেকেই করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

আসল কবিতা বা প্রেমরসসিক্ত লিরিকের জন্মদান করেছে রবীন্দ্রোত্তর যুগ। নীতিকথা লিরিকে বিবেচ্য নয়। বিদ্রূপের মতোই নীতিবচন কবিতার প্রাণহানি ঘটায়। তেম্নি বিদ্রূপের কশায়, কঠোরতার পাথরে কাব্য-সরস্বতীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়।

অবশ্য নরনারীর কামজ প্রেমই যে উৎকৃষ্ট কবিতার একমাত্র জনক তা স্বীকার করাও অপলাপ। প্রকৃতি-ব্যঞ্জক কবিতার অস্তিত্ব যদি মুছে না ফেলতে চাই তাহলে আমরা বলব যে 'রোমান্টিক' কবিতাও উৎকৃষ্ট ফসল দান করতে সমর্থ। 'লিরিক' লক্ষণ ও 'রোমান্টিক' লক্ষণ ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত না হলে বোঝা মুস্কিল। এই দুই লক্ষণে সমন্বিত হওয়ার ফলে কী ধরনের কবিতা সম্ভবপর হয় তা-ও জানা থাকা দরকার রবীন্দ্রোত্তর কাব্য-প্রসঙ্গে প্রবেশ করতে হলে। নজরুল ইসলামের পর জসীমুদ্দিনের আবির্ভাব যেন গায়কের পর চিত্রশিল্পীব আবির্ভাব। লিরিকের পর রোমান্টিকের আবির্ভাব এম্নি ঘটেছিল ইংল্যাণ্ডে। চসারের চর্য্যার গুণাগুণ আমরা কেন, ইংল্যাণ্ডও বিকৃত করেই হয়ত ধরতে পেরেছে যেহেতু তিনি দুইগুণে সমন্বিত মহাকবি। রবীন্দ্র-কাব্যও আমরা বিকৃত অর্থে বুঝতে শিখেছি যেহেতু তিনি শতগুণে মহিমান্বিত কবি। তবে শত-ই সংখ্যার সমাপ্তি ঘটায়না—সংখ্যা অসংখ্য হতে পারে। রবীন্দ্রোত্তর সৎ বাংলা কবিতা শত-সংখ্যার পরেকার সংখ্যার ঘরগুলোতে ছড়িয়ে পড়ছিল এ-শতকের সুরু থেকেই। রবীন্দ্রনাথ শতকের ঘর পূরণ করেছেন, তার বাইরে তাকাননি।

সত্যেন্দ্রনাথের 'যক্ষের নিবেদন'-এর উল্টোসুর শুনিয়ে মোটা-মুটিভাবে কল্লোল-যুগ সুরু। এই অতীন্দ্রিয় লিরিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতায় ফিরিয়ে আনার কাজ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত করে গেছেন—যার গভীরতা হেমেন্দ্র রায়ের চটুলতাকে বিদ্রূপবিদ্ধ করেছে। কিন্তু কল্লোল-যুগে হেম বাগচী, যুবনাশ্ব এবং অচিন্ত্য-কুমার অত্যন্ত সদন্তঃকরণে লিখে গেছেন 'সনেট' যাতে লিরিক-সত্তা সংযমের বন্ধনে চলে এসে রোমান্টিক প্রকোষ্ঠে বসবাস করবার সুযোগ লাভ করে:

গোপন

হেমচন্দ্র বাগচী

আমার গোপন প্রেম রাখিব গোপনে
সুশীতল তরুকুঞ্জে তৃণগুল্মছায়,
তরুণী কিশোরী সম আনত নয়নে
রহিবে সে দীর্ঘরাত্রি মিলন-সজ্জায়।
যদি বায়ু বহে যায় বসন্তের দিনে
উড়ায়ে মুকুল-গন্ধ সুমন্দ মন্থর
যদি কোনো অজানিতা ফেলে তারে চিনে
তথাপি কি কাঁপিবে না আমার অন্তর ?
আমার কৈশোর প্রেম রাখিব গোপনে
নিভৃত নির্ঝর ধারে কাশবন মাঝে,
তরুণী কিশোরী সম আনত নয়নে
রহিবে সে দীর্ঘরাত্রি বিরহের সাজে।
গীতিহীন বনভূমি নিস্তব্ধ নির্জ্জন,
আমার কৈশোর প্রেম রহিবে পোপন।

প্রকৃতি-ভুঞ্জন কিশোর-চিত্তের প্রেমের সমান। তবে তা যে কামজ সুখের মতন ছিল, কামজ সুখ পেয়েছে যে চিত্ত সে-ই বলতে পারে মুখর যৌবন-অভিজ্ঞতার পর। কিশোরী প্রেমিকার আবির্ভাব ব্যতিরেকেও ইন্দ্রিয়জ প্রকৃতি-ভুঞ্জন চলে। সুধীর রায়-চৌধুরীতে এই মনোভঙ্গী মুক্তক পয়ারে ধাবিত হয়েছিল।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রবর্ত্তনা বাংলা সাহিত্যের মুক্তি প্রাণতার সঙ্গে জড়িত হতে সুরু করেছিল শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে, তবে কল্লোল-যুগে সূত্রগুলো তড়িৎ-গতিতে বজ্রজ্বালা ও তীব্র দ্রুতি নিয়ে সম্পন্ন হচ্ছিল। তাই ইংরাজী-সাহিত্যের সুযোগ্য ছাত্র যুবনাশ্ব (মণীশ ঘটক) শোনালেন মাত্রিক-ছন্দে সনেটের সুর ঃ

দেবী ত নহ, তোমারে তবে কেমনে পূজা করি
তোমার মুখে দিব্য প্রভা বৃথাই খুঁজে মরি
তোমার আছে দেহ, আছে নিটোল দুটি স্তন
ললিত বাহু বিশাল উরু তপ্ত পরশন ;
রক্ত-রাঙা দাড়িম্বের মতোন দুটি ঠোঁটে
যে সুধা ক্ষরে তাহারি তরে লুব্ধ অলি জোটে।

আমাব দোষ—জুড়িয়া কর, যাচিয়া পবসাদ
স্তাবক-কুল-সুলভ হাসি টানিয়া আঁখিপাশে
আসিনি আমি। মিথ্যা মোহে হানিয়া পবমাদ
পরুষ করে ছলনাজাল ছিঁড়েছি অনায়াসে ;
দেহের সুবা করেছি পান, খুঁজিয়া বিদেহীরে
অলীক ক্ষোভে, অতৃপ্তিতে, যাইনি আমি ফিরে !

তোমার মুখে দিব্য বিভা খুঁজিনি কভু ভুলে,
ভুলিতে নাবি পেয়েছি যাহা, বেখেছি বুকে তুলে !

প্রেম ও অপ্রেম মিশতে সুরু কবেছিল কল্লোল-যুগের পুরুষ-কবির চিত্তে। দেহ এবং মন এ-দু'টো বস্তুর বনিবনাও হয়নি প্রেমানুসন্ধানীর চিত্তে। গ্যেটেব মতো বিদগ্ধতা নিয়েও মেদ-পঙ্কে যেতে পারে পুরুষ—যুবনাশ্ব সে-ঘটনারই ছায়াপাত কবেছেন এখানে।

সূক্ষ্ম-বিচারে দেখতে গেলে আমরা বলতে বাধ্য যে 'কল্লোল' দু'টি শব ফেলে এসেছে—লিরিকের উদ্দামতার শব আর ইংরেজী কবিতার রোমান্টিক মনোভাবের শব। অচিন্ত্যকুমারের 'অমাবস্যার'-কবিতাবলী অতি সুস্পষ্টভাবে আমাদের এই উক্তি সমর্থন করবে।

অচিন্ত্যকুমার রোমান্টিক হলেও যে চিত্র তিনি 'অমাবস্যা'-র কবিতায় এঁকেছেন তার নায়ক নৈরাশ্য-মুখর। নায়িকা বহুবল্লভা। অমাবস্যার পরেকার অধ্যায়ে যখন মাত্রিক ছন্দের দোলা এড়িয়ে তিনি সনেটের পয়ারী বন্ধনে এলেন তখন 'প্রেম' সম্পর্কে তিনি কল্লোলোত্তর 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকায় এই মনোভঙ্গী ব্যক্ত করলেন :

কী করে দেখাবো প্রেম, যদি দেহ রহে নিরুত্তর
শাণিত শোণিতে যদি নাহি পায় উষ্ণ উন্মাদনা,
ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজালে নহে যদি আচ্ছন্ন প্রহর,
তবু প্রেম ? প্রেম নহে কায়াহীন কথার ছলনা।
আমার এ প্রেম, সখী, কামনা সে নিরবগুণ্ঠনা,
উদ্বেলিত উদধির ফেনিল রুধির, মোর গান
দেহের দুর্দ্দান্ত দাহ, অস্থিময় অস্তিত্ব-চেতনা
আমার শরীরে সখী, সীমাহীন প্রেমের প্রমাণ।
প্রেম নহে ভাবপদ্ম, প্রেম শুধু আমার শরীর ;
আমি তার বিত্রবহা, মর্ত্ত্যরূপ, আমি তার চিতা ;
আমার শরীরে সখী, মুহুর্মুহু মদির নদীর
তরঙ্গ সজ্ঘাততীক্ষ্ণ বেগোময় উলঙ্গ শুচিতা।
দেহেরে নিরুদ্ধ করি এ-প্রেমের কোথা পাই ভাষা ?
কী করে বোঝাবো তারে ? দেহে তার প্রকাশ-পিপাসা

এ-দেহবাদ লরেন্স, বোদলেয়ার থেকে ধার করে আনতে হয়েছে এ-শতকে কিন্তু এর সুর, এর গীতি ভারতবর্ষের শিল্পে-সাহিত্যে বহুবার তরঙ্গিত হয়েছে। কিন্তু তখন সুধীন্দ্রনাথ তাঁর 'পরিচয়ে' নৈরাশ্য ধ্বনিত করে যাচ্ছেন উনিশ-শতকীয় অপলাপী জীবনকে বিদ্রূপ করে। সুধীন্দ্রনাথ যেন যতীন্দ্রনাথ ও যুবনাশ্ব স্পর্শিত একটি বিদ্যুল্লাস্য।

কিন্তু পূর্ব্বাশা পত্রিকা 'লিরিক', 'রোমান্টিক' বা এতদুভয়ের সমন্বিত রূপব্যঞ্জক কবিতায় আকৃষ্ট ছিল ১৩৩৯-৪০ বঙ্গাব্দে। তাই পূর্ব্বাশা ছিল কল্লোল-প্রগতি-পরিচয়ের কাব্যাদর্শে উৎসাহী একটি সাহিত্যবাহন পত্রিকা এবং নবীনতর কাব্য-পরীক্ষারও পক্ষপাতী। অজয় ভট্টাচার্য্য (নজরুল-পন্থী), মনোজ বসু (লিরিক-পন্থী), বিষ্ণু দে (এলিঅট-পন্থী) সেই সময়কার পূর্ব্বাশার নবীন কবি। অনুভূতির ক্ষেত্র এবং পরিশীলিত আবেগ যে-চিত্তবৃত্তির পরিচয় দেয় পংক্তি রচনা দ্বারা, তাকেই কবিতা বলে স্বীকার করা সম্ভবত রবীন্দ্রোত্তর কাব্য-বিচারের মাপকাঠি হওয়া উচিত।

আজকের দিনে শত দেহবাদী কবিতাও যে ঊনিশ-শতকীয় বলদেব পালিতের 'বিরহিণীর উক্তি' লিপিবদ্ধ করবে না কাব্য-বিচার করতে গেলে প্রথমেই তা আমাদের ভেবে দেখা উচিত। "কি দোষে দহিছ কাম আমার হৃদয় ?" এর মতো প্রশ্ন নিয়ে কবিতা চর্চা নেই এখন, কিন্তু দহনের জটিল ভঙ্গীর বিবৃতি নূতন পর্য্যায়ে সুরু হয়েছে বিশ-শতকীয় পঞ্চাশোত্তর দশকে।

জীবনানন্দ দাশ

॥ এক ॥

এখন থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে জীবনানন্দ দাশ কবিতা লিখ্‌তে সুরু করেন। পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার বাংলা কবিতায় যে কবিকে অত্যন্ত সঞ্চরণশীল দেখা যেত তিনি হচ্ছেন সত্যেন দত্ত। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তখন শিখরারূঢ়স্থিত উজ্জ্বল। কিন্তু যে কোন তরুণ কবি কাব্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে প্রথমেই যাঁকে দেখ্‌তে পেতেন তিনি রবীন্দ্রনাথ নন—সত্যেন দত্ত। তরুণ মনকে আকর্ষণ করবার মত পুঁজি সত্যেন দত্তের যথেষ্টই ছিল। ছন্দের ঝঙ্কার বা মিষ্টি কথার অনুপ্রাস ছাড়াও একটা সহজবোধ্য উদারতার আশ্রয় ছিল সত্যেন দত্তীয় কবিতায়। জীবনানন্দ সত্যেন দত্তকে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি খুঁজে বার করতে চাননি। এ-ধরনের কবিতায়ঃ

"সে কোন্ ছুঁড়ির চুড়ি আকাশ-শুঁড়িখানায় বাজে
চিনি মাখা ছায়ায় ঢাকা চুনীর ঠোঁটের মাঝে—(ঝরাপালক)

রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যায় না—সত্যেন দত্তের স্বাক্ষরই এখানে উজ্জ্বল।

তখনকার দিনের নিরুত্তাপ সমাজ-জীবনে নূতন অনুভূতির উত্তাপ নিয়ে অকস্মাৎ যে একটি প্রবল ভাববন্যা এসে উপস্থিত হয়েছিল—তাকে আমরা বল্‌তে পারি অসহযোগ আন্দোলন। সুপ্ত দেশাত্মবোধ জেগে উঠে বাঙালীর মনে যতোটা সাড়া তুল্‌ল, বাংলাদেশের আবেগ-প্রবণ কবিদের মনে তার চেয়ে অনেক বেশি তা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। বাংলা কবিতায় অসহযোগ আন্দোলনের দান অবিস্মরণীয়। সত্যেন দত্তের দেশাত্মবোধই তাঁর শেষের দিকের কবিতাগুলোকে বিবেকানন্দীয় সমাজ-চেতনায় রঞ্জিত করে দিয়ে

গেছে। তাছাড়া এই দেশাত্মবোধ—জাতিকে নিবিড় আত্মীয়বোধে চিনে নেওয়া—কুসংস্কারের স্থবির নাগপাশ মাকড়সার জালের মত হেলায় দু'পাশে সরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা থেকেই আরেকজন কবির নবজন্ম হল—তিনি বিদ্রোহী-কবি নজরুল ইস্‌লাম। সত্যেন দত্তীয় কাব্য-ভঙ্গীর পথে যাঁরা সার্থকতার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই নজরুল ইস্‌লামের পথে এসে দাঁড়ালেন। 'ঝরাপালকে'র যুগে—কাব্য-রচনার শৈশবে জীবনানন্দের মধ্যে তাই আমরা একটি প্রাণপূর্ণ বিদ্রোহী সত্তার আবির্ভাব দেখ্‌তে পাই।

সত্যেন দত্তের সাবেকী পথ ছেড়ে তাঁরই নূতন পথে যে জীবনানন্দের বিচরণ সেই পদচিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর 'ঝরাপালকে'র 'দেশবন্ধু', 'হিন্দু মুসলমান', 'বিবেকানন্দ', 'পতিতা' প্রভৃতি কবিতায়। তারপব :

নৃত্য-গীত হাসি-অশ্রু-উৎসবের ফাঁদে
হে দুরন্ত দুর্নিবার—প্রাণ তব কাঁদে!
ছেড়ে গেলে মর্ম্মন্তুদ মর্ম্মর-বেষ্টন,
সমুদ্রের যৌবন-গর্জ্জন
তোমারে ক্ষ্যাপায়ে দেছে, ওহে বীর-শের
টাইফুন-ডঙ্কার হর্ষে ভুলে গেছ অতীত-আখের
হে জলধি পাখী! (নাবিক—'ঝরাপালক')

এ-ধরনের কবিতাগুলোতে আমরা নজরুলেব ধ্বনিই শুনতে পাই। নজরুলের সাহচর্য্য ছাড়া সেদিন মুক্ত যৌবন তার ভাষা খুঁজে পায়নি: সত্যেন দত্তে যৌবনের উত্তাল উদ্দামতা ছিলনা, মোহিতলালের যতটুকু ছিল তা-ও উদ্দেশ্যমূলক—তাই গম্ভীর। নির্ব্বাধ, উদ্দেশ্যহীন, যুক্তিহীন যৌবনের প্রাণ-চঞ্চলতায় নজরুল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আবেগ-ঘন মন নিয়ে জীবনানন্দ যে নজরুলের দিকেই ঝুঁকে পড়বেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনে সমরোত্তর রুশ-বিপ্লবের ছিঁটে-ফোঁটাও যে এসে না মিশেছিল এমন নয়। বিশ্বমানবের মৈত্রীর পরিকল্পনা বাংলাদেশের মনে যদিও নূতন নয়, চণ্ডীদাস বা বিবেকানন্দে যদিও তা আন্তরিকতার সঙ্গেই উপস্থিত—তবু সেই ঘুমন্ত ইচ্ছাকে রুশ-বিপ্লবের ধ্বনিই খানিকটা তখন জাগিয়ে দিয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' উপন্যাস তার সাক্ষী। 'অতি আধুনিক' বলে পরিচিত সাহিত্যিক গোষ্ঠীতে যে গোষ্ঠিতে জীবনানন্দও একজন—এ-অনুভূতির যে কাব্যিক বিকাশ হল তা শুধু বিশ্বমানব-ধর্ম্মীই নয়—বিশ্বপ্রকৃতিধর্ম্মী বা হুইটম্যান-ধর্ম্মী। অনুভূতিকে প্রসারিত করতে থাকলে মানুষের গণ্ডী ছাড়িয়ে তা বিশ্বপ্রকৃতিকে জড়িয়ে ধরবেই। হুইটম্যানের কাব্যিক জীবন সুরু তাই বাল্মীকির নমুনায়—সঙ্গীহারা এক পাখীর ডাকের ব্যথা তাকে সমস্ত জীবন অনুসরণ করে বেড়িয়েছে। অতি-আধুনিক কবি অচিন্ত্য সেনগুপ্ত যে-প্রেরণায় লিখেছিলেন :

কীটের পাখার অস্ফুটতম বেদনা আমারে হানে

সে-প্রেরণাতেই জীবনানন্দ লিখেছেন :

কীটের বুকেতে যেই ব্যথা জাগে আমি সে বেদনা পাই।

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত যখন লিখ্‌লেন :

আমার পরাণে ভাই
কোটি মানবের অশ্রুজলের জোয়ার শুনিতে পাই—

জীবনানন্দও না লিখে পারলেন না :

লভিয়াছে বুঝি সাঁই
আমার চোখের অশ্রুপুঞ্জে নিখিলের বোন ভাই।—'ঝরাপালক'।

'ঝরাপালক' বইটিকে জীবনানন্দের কবিতার ভিত্তিস্থল বলা যায় না—এই মাত্র বলা যায়, তখন জমি চাষ হচ্ছে, এতেই ফসল ফল্‌বে কিন্তু ফসলের অঙ্কুরও এ নয়। এ শুধু বাষ্প—মেঘ হয়ে জম্‌ছে

গিয়ে আকাশের গায়ে, বৃষ্টি ঝরাতে পারে তেমন মৌসুমী বায়ু এখনো আসেনি। বৃষ্টি ঝরল—তাঁর দ্বিতীয় বই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র ধূসরতা কবির জীবনের একটি অধ্যায় হলেও সব সময়েই তিনি জীবনের রুগ্নতাকে উপলব্ধি করেছেন বলে মনে হয়না। জীবনের পেছনে একটা প্রখর প্রাণশক্তি দেখতে পেয়েছেন তিনি, যা প্রায় বের্গসঁর Elan Vital-এর মতো :

> আমাকে দিয়েছ তুমি হৃদয়ের যে এক ক্ষমতা
> ওগো শক্তি, তার বেগে পৃথিবীর পিপাসার ভার
> বাধা পায়, জেনে লয় নক্ষত্রের মতন স্বচ্ছতা।
> ('অনেক আকাশ'—ধূসব পাণ্ডুলিপি)।

কিন্তু Elan Vital-এর তাড়নায় হৃদয়ের আবেগের পথে এই যে জীবন খুঁজতে যাওয়া, তা সভ্য মানুষেব জাবন নয়—প্রাণস্ফূর্তিতে প্রকৃতির কোলে যে সহজ জীবন বিস্ফারিত হয়ে উঠছে তার প্রতিই এই আবেগ মানুষকে আকৃষ্ট করে। তাই কবি বসন্তেব বাত্রিতে পাখীর স্বরে জীবনের প্রতি একটা আকাঙ্ক্ষা শুনতে পান ('পাখারা' —ধূসর পাণ্ডুলিপি), তাই তাঁব মনে হয় :

> নক্ষত্রের পানে যেতে যেতে
> পথ ভুলে বাব বাব পৃথিবাব ক্ষেতে
> জন্মিতেছি আমি এক সবুজ ফসল।
> ('পিপাসার গান'—ধূসর পাণ্ডুলিপি)।

তাঁর কাছে এ-জীবনের উপভোগ এত সম্পূর্ণ মনে হয় যে

> শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, নক্ষত্র, আকাশ
> আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারোমাস—
> ('মৃত্যুর আগে'—ধূসর পাণ্ডুলিপি)।

তাদের কাছে আর মৃত্যুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে কোন দ্বিধা নেই। শুধু যে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় অন্তরঙ্গতা থেকেই

জীবনের উপর তাঁর এই আকর্ষণ এসেছে তা নয়—জীবনের প্রতি এই দুরন্ত মোহ তাঁর প্রেমের উপলব্ধি থেকেই :

সে এক বিস্ময়
পৃথিবীতে নাই তাহা

*　　　　*

কোনো এক মানুষীর মনে
কোনো এক মানুষের তরে
যে জিনিষ বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে।
('নির্জ্জন স্বাক্ষর'—ধূসর পাণ্ডুলিপি)।

যে-প্রেমের জন্যে জীবনের এত স্বাদ সে-প্রেম স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনে জীবনের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। প্রাণের উপর প্রেমের শত অত্যাচারেও প্রাণ বেঁচে থাকে প্রেমকেই আবার খুঁজে নেবে বলে'—জীবনকে ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়ে গেলেও প্রেমকে জীবন ভোলেনা :

আগুন জ্বলিয়া গেলে অঙ্গারের মত তবু জ্বলে
আমাদেব এ জীবন···· ····
('প্রেম'—ধূসর পাণ্ডুলিপি)।

কিন্তু প্রেম যে জীবনকে ছিঁড়ে দিয়ে যেতে পারে এ সত্য-বোধ কবির আছে। তিনি প্রেমের আঘাতে আহত হয়েছেন, ব্যথিত হয়েছেন। এ-ব্যথা ধীরে ধীরে তাঁর মনে পাণ্ডুরতার ছায়া ফেলতে সুরু করেছে—তাঁর কণ্ঠে প্রাণশক্তির আর উদ্দামতা নেই, নম্র হয়ে এসেছে কণ্ঠ :

দেহ ঝরে, তাব আগে আমাদের
ঝরে যায় মন!　　　('১৩৩৩'—ধূসর পাণ্ডুলিপি)।

ক্ষণিকবাদের আপাত-ভাসমানতার আড়ালে ক্ষণিক-প্রেমেব স্মৃতি মানুষের বুকে ব্যথা জাগাতে বাধ্য। কবি এখানে উজ্জ্বলতা হাতড়ে বেড়ালেও ধূসরতাকেই ভাষা দিয়েছেন :

তুমি শুধু একদিন—এক রজনীর

নিশীথের বাতাসের মত
একদিন এসেছিলে,—
দিয়েছিলে এক রাত্রি দিতে পারে যত।
('সহজ'—ধূসর পাণ্ডুলিপি)।

প্রেমের অ-স্থিরতা কবির জীবনকে যে ম্লান করে দিয়েছে সে-অনুভূতি তাঁর প্রত্যক্ষ ও ঋজু। তখনো মনের বাঁক ঘুরিয়ে দিয়ে স্বপ্নে পলায়ন করবার ইচ্ছা তাঁর হয়নি, বিচার-শক্তি তখনো কাজ করে যাচ্ছে। রূপকথার মেয়েরা যে জীবন্ত নয়, তারা যে স্রেফ ছায়ার শরীর—সব যাদু, সবই মায়া সে-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ কবির নেই ('পরস্পর'—ধূসর পাণ্ডুলিপি) আর সেসব মায়াবীদের সঙ্গে কবি তুলনা করে দেখাচ্ছেন এ-যুগের বারবণিতাকে যারা এক সময় মোহ তৈরী করে তোলে কিন্তু আসলে যারা বাসি, মেকি। প্রেমের অপঘাতে বারবণিতার প্রেমের কথাও যদি কবির মনে উঁকি দিয়ে যায় তাহলে কি আমরা অনুমান করতে পারিনে যে তাঁর জীবন খুবই অসুস্থ হয়ে উঠেছে ? সত্যি, প্রেম যে দেহ-বহির্ভূত কোনো শুভ্রতা নয় এ-উপলব্ধিও কবির মনে এসে তখন উপস্থিত হয়েছে। প্রেমের শরীর থেকে প্রাক্তন রোমান্টিসিজ্‌ম্ ঝরে গেছে তখন তাঁর দৃষ্টিতে। বার্নার্ড শ যাকে বলেছেন 'Tyranny of Sex'—শ যে চোখে প্রেমকে দেখেছেন : "The whole world is strewn with snares, traps, gins and pitfalls for the capture of men by women"—সে চোখ নিয়েই জীবনানন্দ প্রেমের দিকে তাকাচ্ছেন ('ক্যাম্পে'—ধূসর পাণ্ডুলিপি) :

আমার হৃদয়—এক পুরুষ হরিণ—
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
চিতার চোখের ভয়—চমকের কথা সব পিছে ফেলে রেখে
তোমারে কি চায় নাই ধরা দিতে ?

এ-ধারণা নিয়ে কবি তাই আর জীবনকে আগেকার অনাবিল উদ্দাম প্রফুল্লতায় গ্রহণ করতে পারেননা। তাঁর মনে হয়ঃ

মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়—প্রেম নয় কোনো এক বোধ কাজ করে।
('বোধ'—ধূসর পাণ্ডুলিপি)।

সে-বোধ উদ্দেশ্যহীন, চঞ্চল। ভালোবাসা আর প্রত্যাখ্যান, পাওয়া আর ছেড়ে যাওয়া—পৃথিবীর কুশ্রীতাকে জড়িয়ে থাকাই তার ধর্ম্ম! শুধু তা-ই নয়, কবি এবার জীবনকে তাঁর ম্লান হৃদয় দিয়ে আরেকটু গভীরভাবে দেখতে চেয়েছেন। এবার জীবন আর তাঁকে উপভোগের সম্পূর্ণতা দান করছেনা—জীবনের অ-স্থিরতা আর মৃত্যুর রহস্যময় স্থিরতা জেনে নিয়ে মৃত্যুকেই তিনি ভালোবেসে ফেল্‌তে চাইছেন। এখন তিনি প্রায় দার্শনিকঃ

যে ভালোবেসেছে, তার হৃদয়ের ব্যথার মতন ;—
কাল যাহা থাকিবেনা,—আজই যাহা স্মৃতি হয়ে আছে ;—
দিন-রাত্রি—আমাদের পৃথিবীর জীবন তেমন।
('জীবন'—ধূসর পাণ্ডুলিপি)।

কিন্তু কবির মনে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেলেও তাদের স্থায়ী আসন সেখানে নেই। পরের মুহূর্ত্তেই কবি আবিষ্কার করে নেন যে তিনি কবি। স্বপ্নের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে কবি পৃথিবীর জীবনের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে চান—সান্ত্বনা খুঁজে নেন। স্বপ্ন কবির এক অপূর্ব্ব সম্পদ। তাকে সত্য বল্‌তে ভাব্‌তে একটু দ্বিধাও হয়না তাঁর। শেলীর রোমান্টিসিজ্‌মের জন্ম যে কারণেঃ "I fall upon the thorns of life! I bleed!"—সেই একই কারণে জীবনানন্দ পাকা বনিয়াদে রোমান্টিক হয়ে উঠেছেন ঃ

ভুলে যাও পৃথিবীর ঐ ব্যথা—ব্যাঘাত—বাস্তব !
সকল সময়
স্বপ্ন—শুধু স্বপ্ন জন্ম লয়
যাদের অন্তরে

*　　*　　*

পৃথিবীর দিন আর রাত্রির রব
শোনে না তাহারা !

*　　*　　*

দিনের উজ্জ্বল পথ ছেড়ে দিয়ে
ধূসর স্বপ্নের দেশে গিয়া
হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার নদী
ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায়—
('স্বপ্নের হাতে'—ধূসর পাণ্ডুলিপি)

এখানেই 'ধূসর'-পাণ্ডুলিপি'র কবির জন্ম হল।

মগজের কাজকে বাতিল করে দিয়ে টেনিসনের Lotos Eaters-এর মতো নিরুত্তেজ অবসর উপভোগের আকাঙ্ক্ষা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি-'র 'অবসরের গানে'ই পাওয়া যায়। কিন্তু মগজকে নির্ব্বাসনে পাঠালে বিশ্বাসের যে একটা সুসংবদ্ধ দৃঢ় ভিত্তি গড়তে হয় সেখানে জীবনানন্দ তা করতে পারেননি। কবির মনে স্বপ্ন ছিল কিন্তু স্বপ্নের জগৎ তখনো তৈরী হয়নি। ছোট ছোট সিম্বলের আভাস সেখানেও আছে—যেমন, অতীতের অনুভূতির সিম্বল 'কার্ত্তিক মাঠের চাঁদ', প্রেমের অনুভূতির সিম্বল কার্ত্তিকের ফলন্ত মাঠ, বিরহের সিম্বল ধানকাটা মাঠ। কিন্তু তখনো তাঁর কবিতায় একটি 'সিম্বলিক' পরিবেশ নিবিড় হয়ে ওঠেনি। এ-পরিবেশ পরিণতি লাভ করেছে 'বনলতা সেন' বইটিতে। এখানে তিনি ইয়েট্স-এর মতো অতীত জগতে আর স্বপ্নের বস্তুতে সৌন্দর্য্য

খুঁজে পেয়েছেন। এমন একটি জগতের জন্যে আকাঙ্ক্ষা তাঁর ব্যক্ত হয়েছে যেখানে হৃদয়ের ইচ্ছা আর অনুভূতির ও কল্পনার উল্লাস তৃপ্তি পেতে পারে! ইয়েট্‌স-এ মতো জীবনানন্দও এ-সময়ে বল্‌তে পারতেন: "I have no speech but symbol"! 'নাটোরের বনলতা সেনের' দিকে কবির প্রেমকাতর হৃদয় অতীতের সমস্ত মোহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। তাঁর অন্তহীন প্রেমানুভূতি কেন্দ্রীভূত হয়েছে 'বনলতা সেনে':

> চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা
> মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য্য; অতি দূর সমুদ্রের পর
> হাল ভেঙ্গে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
> সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর
> তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
> পাখীব নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।
>
> ('বনলতা সেন')।

এ-সঙ্গে যদি আমরা ইয়েট্‌স-কে স্মরণ করি তাহলে শুনতে পাব তিনি বল্‌ছেন:

> For that pale breast of lingering hand
> Come from a more dream-heavy land
> A more dream-heavy hour than this.

অথবা

> When my arms wrap you round I press
> My heart upon the loveliness
> That long has faded from the world.

নাটোরের একটি সাধারণ মেয়ে—বনলতা সেন, তাঁকে কবির প্রেমানুভূতিই কারুকার্য্যখচিত করে তুলেছে। কবির আবেগের

সিম্বল হয়ে উঠেছে সে। বনলতা সেন এখন তাঁর প্রেমের নিবিড়তার মূর্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

ইয়েট্স-এর মতোই জীবনানন্দের মনে প্রেমের অভিজ্ঞতা একটা বিষণ্ণ হতাশার সুর বয়ে আনে। ইয়েট্স-এর চাঁদ তখন 'crumbling moon'—জীবনানন্দেরও তাই :

> হয়ত এসেছে চাঁদ মাঝরাতে একবাশ পাতার পিছনে
> সরু সরু কালো কালো ডালপালা মুখে নিয়ে তার।
> ('কুড়ি বছব পরে'—বনলতা সেন)।

প্রেম ইয়েট্স্‌কে আনন্দের চেতনা এনে দিতে পারেনি—কেননা জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করবাব বিশ্বাস তার কই? এ-যুগে জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করবাব আবেগ নিয়ে যাবা জন্মগ্রহণ কবে' জীবনের জটিলতাব সংঘাতে বিশ্বাস তাদেব বিধ্বস্ত হতে বাধ্য। "She bid me take life easy as the grass grows on the weirs"—কিন্তু তেমন সহজভাবে জীবনকে ভাববাব উপায় ছিলনা ইয়েট্স এর। এ-বিশ্বাস জীবনানন্দের মনেও দানা বাঁধতে পারেনি কিন্তু তাঁর ইচ্ছা আছে, সহজ জীবনেব প্রতি প্রবল আকর্ষণ আছে তাঁর : .

> আমারো ইচ্ছা করে
> ঘাসেব ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
> শরীরে সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে। ('ঘাস'—বনলতা সেন)

সৌন্দর্য্যের অ-স্থিরতা উপভোগে যে-ব্যাঘাত জীবনকে ক্লান্ত করে তোলে, যাতে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে মন তা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ইয়েট্স্ যেমন চান :

> I would that we were, my beloved,
> white birds on the foam of the Sea !

তেমনইতে 'জীবনের টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার' এড়াবার জন্যে জীবনানন্দের ইচ্ছা :

> আমি যদি হতাম বনহংস
> বনহংসী হতে যদি তুমি ;
> কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে
> ধানক্ষেতের কাছে।
> ('আমি যদি হতাম'—বনলতা সেন)।

এখানে হয়ত অনেকে বলবেন—এ হল কবির জীবন থেকে পলায়ন। কবি উত্তর দেবেন—'বাইরের জীবন থেকে এ হচ্ছে সত্যিকারের জীবনের মধ্যে পলায়ন।' এ-কথাই বলা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক, কেননা তিনি আর এখন অসংলগ্নতায় ভেসে বেড়াচ্ছেন না, একটি স্বসম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশ তৈরী করে ফেলেছেন। সেখানে চিলের ডাক বিরহের স্মৃতি আনে ('হায়, চিল'—বঃ সেঃ), বুনো হাঁসের উড়ন্ততায় প্রিয়স্মৃতিতে ভরে যায় হৃদয় ('বুনো হাঁস'—বঃ সেঃ), সেখানে স্বপ্নের 'শঙ্খমালা' আসা যাওয়া করে, ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় হরিণেরা খেলা করে' শেফালিকা বোসের হাসি জাগিয়ে তোলে ('হরিণেরা'—বঃ সেঃ), তারপর সমস্ত অতীত জেগে উঠেছে সে-জগতে। ইয়েট্‌স্-এর ধারারক্ষী ডি লা মেয়ার অতীতের স্পর্শে হৃদয়কে যেভাবে অনুভব করেছেন : "Our hearts stood still in the hush of an age gone by—" জীবনানন্দও অতীতের গুঞ্জরণে তেম্নি নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন :

> ভারত সমুদ্রের তীরে
> কিম্বা ভূমধ্য সাগরের কিনারে
> *অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে*
> আজ নেই কোন এক নগরী ছিল একদিন
> কোন্ এক প্রসাদ ছিল

আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন
আকাঙ্ক্ষা

আর তুমি নারী—

এই সব ছিল সেই জগতে একদিন।

('নগ্ন নির্জ্জন হাত'—বনলতা সেন)

যে নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার হাজার বছর আগে মরে
গিয়েছে

তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে
করে এনেছে :

যে রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় মরে যেতে
দেখেছি

কাল তারা অতি দূর আকাশের সীমানায় কুয়াশায় কুয়াশায়
দীর্ঘ বর্শা হাতে করে

কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন।

('হাওয়ার রাত'—বনলতা সেন)

যে-জগৎ জীবনানন্দ তৈরী করে নিয়েছেন আবেগের তাড়নায় তা দৃশ্যের বিষয়ীভূত নয়, উপলব্ধির বিষয়ীভূত। স্বচেতন আবেগে তৈরী এ-উপলব্ধি, তা দিয়ে বিভিন্ন পর্য্যায়ের শিল্পভঙ্গী তৈরী হ'তে পারে। তাতে জীবনানন্দ সিট্‌ওয়েল-গোষ্ঠীর মতো ইমেজিস্ট (Imagist) হয়ে পড়েছেন স্থানে স্থানে, ক্বচিৎ সুর-রিয়্যালিজ্‌মও যে উঁকি দিয়ে যায়নি তা নয়। অস্‌বার্ট সিট্‌ওয়েল যে চোখে দেখেন "Hot yellow grass, a yellow palm rising" অথবা উপলব্ধি করেন "Droning heat" খুঁটে যাচ্ছে নীরবতা ঠিক তেম্নি জীবনানন্দও দেখতে পান "রূপালি চাঁদের হাত শিশিরে পাতায়" অথবা "প্রতিভার দীর্ঘবাহু বাড়ায়ে দিয়েছে" অথবা "রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ"। কিন্তু এই উপলব্ধির জগৎ বা স্বপ্নের জগৎ যে তাঁর নিজের তৈরী এ-সম্বন্ধে কবি ক্রমেই সচেতন

হয়েছেন : "মরণের হাত ধরে স্বপ্নছাড়া কে বাঁচিতে পারে?"—('স্থবির যৌবন'—কবিতা ১৩৪৪)—অনুরূপ সচেতনতা ডি লা মেয়ারেরও ছিল: "The skill of words to sweeten despair······where life has but one dark end."

শেষে একদিন কবি শুনতে পান—"স্বপ্নের ধ্বনিরা এসে চলে যায়: স্থবিরতা সব চেয়ে ভালো" ('স্বপ্নের ধ্বনিরা'—কবিতা ১৩৪৪)।

শীতের রাতে তাঁর 'হৃদয়ে মৃত্যু আসে', 'শিশিরের মত, হলুদ পাতার মত' ঝরে যায় হৃদয়, জান্‌তে পারেন কবি 'কোকিলের গান ব্যবহৃত হয়ে গেছে', 'সিংহ অরণ্যকে পাবে না আর', পৃথিবী 'কোনোদিন কিছু খুঁজে পাবে না' ('শীতরাত'—কবিতা ১৩৪৪)। কবির এই স্বপ্নভঙ্গ তাঁকে বিনষ্ট করে দিয়ে যায়নি, খুলে দিয়েছে নূতন পথ। "I grow old among dreams" বলে ইয়েট্‌সও নূতন পথের সন্ধান পেয়েছিলেন ঠিক এম্নি স্বপ্নভঙ্গের পর:

> "Through all the lying days of my youth
> I swayed my leaves and flowers in the sun
> Now I may wither into the truth."

যৌবনের শেষে স্থবিরতার পথে সত্যকে খুঁজতে এগিয়ে গেছেন জীবনানন্দ। এ তাঁর এক সম্পূর্ণ নূতন জগতে অভিযান। অথবা বলা যায়, সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টি নিয়ে এবার তাঁর অভিযান। এখন আর চোখ তাঁর স্বপ্ন-মেদুর নয়, জিজ্ঞাসায় তা প্রখর। মন ছেড়ে মননের পথে এসে কবি দেখ্‌লেন, আজকের দিনের জীবন আমাদের জটিল সমস্যায় ঘেরা। বিংশ শতাব্দীর প্রশ্নসমাকীর্ণ জীবনকে যখন তিনি বুঝতে চাইলেন তখন তাঁর ভাষা থেকেও স্বপ্নের সেই প্রাক্তন কোমল-ঋজুতা ঝরে পড়েছে, ক্রমেই এসেছে তাতে গদ্যভঙ্গী, মিশেছে

জটিলতা। আজকের দিনে হৃদয়ের আকুতি নিয়ে যে বাঁচা যায়না, যে-শৃঙ্খলায় তন্ময় হয়ে আছে আকাশ, বাতাস, নদী তা যে কবির হৃদয় খুঁজে পায়না—বাস্তব-জীবনের সঙ্গে সংঘর্ষে আবেগের জীবনের এই যে পরাজয় তার আভাস পাওয়া যায় তাঁর 'গরিমা' কবিতায়। এই আকাশ, বাতাস, নদী—এরা পৃথিবীর গরিমারই অভিজ্ঞান যা হয়ত এ-শতাব্দী অবসান করে দেবে। মোহমুক্তি হয়েছে বটে কবির কিন্তু তার ব্যথাকে তিনি সঙ্গী করে নিয়েছেন। এই ব্যথা নিয়ে, গরিমার স্মৃতি নিয়ে তিনি যদি জীবনের সত্যিকারের সার্থকতা খুঁজতে চান তবে তিনি যুক্তির হাতেও জীবনের মানের নাগাল পাবেন না, তলিয়ে যাবেন অন্ধকারে ঃ

এই তো জীবন
সমুদ্রের অন্ধকারে প্রবেশাধিকারে
নিপট আধার ;
ভালো বুঝে পুনরায়
সাগরের সৎ অন্ধকারে নিষ্ক্রমণ

এই অন্ধকারাচ্ছন্ন পারিপার্শ্বিক থেকে একটু মুক্তি পেয়েও তিনি যা দেখ্ছেন তা খুব আশাপ্রদ নয় ঃ

সর্ব্বদাই প্রবেশের পথ রয়ে গেছে
এবং প্রবেশ করে পুনরায় বাহির হবার
অরণ্যের অন্ধকার থেকে এক প্রান্তরের আলোকের পথে ;
প্রান্তরের আলো থেকে পুনরায় রাত্রির আঁধারে।

জীবনের উপর এই যে প্রান্তরের আলো তার কোনো আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য তিনি খুঁজে পাননি। এখানে তিনি বিংশ শতাব্দীর মন

প্রায় তৈরী করতে সুরু করেছিলেন। তারপর প্রায় বৈজ্ঞানিকের মতো তিনি প্রশ্নও করেছেন :

জীবাণুর থেকে আজ কৃষক, মানুষ
জেগেছে কি হেতুহীন সংপ্রসারণে ··?

('ক্ষেতে প্রান্তরে' — নিরুক্ত পত্রিকা)।

প্রকৃত বৈজ্ঞানিক খুশী আছেন এ-মীমাংসা নিয়ে যে জীবনের বিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যই পকৃতি থেকে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে তা প্রকৃতি জয় করে চল্‌বে। কিন্তু জীবনানন্দ বিজ্ঞানের এ-ধারাকে গ্রহণ করেন নি, প্রকৃতিগত সহজ মানুষে এসেই তাঁর কল্পনা থেমে গেছে ('ক্ষেতে প্রান্তরে')।

জীবনানন্দের ইদানীংকার দৃষ্টিভঙ্গীর একটা পরিণত রূপের আভাস আছে 'বিভিন্ন কোরাস' (নিরুক্ত আশ্বিন ১৩৪৯) কবিতায়। আমাদের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে কবি যা দেখতে পেয়েছেন তারই বর্ণনা আছে একসঙ্গে গ্রথিত চারটি কবিতায়। আমাদের জীবন নিরুত্তাপ, আচারনিষ্ঠ, শালীন ; এই নিয়েই আমরা খুশী—স্বপ্নও মাঝে মাঝে উঁকি দেয় :

আমাদের হৃদয়ের নদীর উপর দিয়ে ধীরে
এখনো যেতেছে চলে কয়েকটি শাদা রাজহাঁস।

কিন্তু আমাদের পর আমাদের সন্ততিদের জন্যে নিরেট বাস্তবতাময় জীবন যদি আসে, যদি তখনকার দার্শনিক মতবাদ মানুষের জীবনের সার্থকতা খুঁজে না পায়, তখন 'মূর্খ আর রূপসীর ভয়াবহ সঙ্গম এড়ায়ে স্থির হয়ে রবে না কি সন্ততিরা ?' আর এভাবে 'মানুষের শেষ বংশ লোপ পেলে কে ফিরায়ে দেবে জীবনের বাস্তবতা ?' কাজেই বাস্তবতার ধার ঘেঁষে লাভ কি ? স্বপ্নই সত্য। দীর্ঘযাত্রা শেষেও কবি স্বপ্নকে ভোলেননি।

'সময় কীটের মত কুরে যায় আমাদের দেশ'—'দীপ্তিময় দিনের' 'সান্দ্র বিশ্বাস' আমাদের পিতা-পিতামহদের ছিল, আমরা সে-বিশ্বাস

হারিয়ে ফেলেছি। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় আচ্ছন্ন আমরা ঃ 'আমাদের সন্ততিও আমাদের হৃদয়েব নয়।'

আমবা মধ্যম পথে বিকেলেব ছায়ায় রয়েছি ;
একটি পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের আগে ;
আবেকটি পৃথিবীব দাবী
স্থির করে নিতে হলে লাগে
সকালের আকাশের মতন বয়স।

সেই প্রভাতেব পবিচ্ছন্ন নবীনতা পেতে হলে একটি পরিপূর্ণ অন্ধকাব বাত্রি চাই। এই 'স্বধর্ম্মনিষ্ঠ' বাত্রি আসে প্রকৃতিগত জীবনের বৃত্তে, মাধ্যমিক জীবনে নয়। প্রকৃতির বাজত্বে

রাত্রি তার অন্ধকাব ঘুমাবাব পথে
আবাব কুড়ায়ে পায় এক পৃথিবীর মেয়ে, ছেলে।

কিন্তু এখন যে পৃথিবাব্যাপী প্রদোষ তা কী সূচনা করছে? কবি সে-সম্বন্ধে নিঃসংশয় হ'তে পারছেন না। এ-ক্রান্তি জীবনের না মরণের? 'আকাশেব ফিকে রং ভোরের কি সন্ধ্যার আধার?'

এ সংশয়বিদ্ধ চেতনা এসেছে তাঁব স্বপ্নভঙ্গের পরও স্বপ্নলগ্ন হয়ে থাকাব ফলে। তিনি সত্যের প্রতি সুবিচার দেখাতে পারছেন না। প্রকৃতিগত সহজ জীবন আব স্বপ্ন তাঁর মনে সারাক্ষণ গুঞ্জরণ তুল্‌ছে—বিজ্ঞানেব বাঁধা-সড়কে তিনি যাবেন না। অথচ বৈজ্ঞানিক যুক্তির ধারায় জীবন অন্য খাতে বয়ে যাচ্ছে, তিনি লক্ষ্য করছেন! হতে পারে যে একটি জগৎ (অনুভূতির জগৎ) ভেঙে দিয়ে আরেকটি জগতে (বাস্তব জগতে) তাঁকে প্রবেশ করতে হয়েছে বলেই দ্বিতীয় জগতেব স্থিবতা সম্বন্ধে মনে তিনি আশ্বাস পাচ্ছেন না। এই সঙ্কট তাঁর মনকে, ভাষাকে অনবরতই জটিল করে তুলছে। কবির নিজের কথায়ই তাঁর ইদানীংকার কবিতা সম্বন্ধে শেষ উক্তি করা যায়ঃ "সম্প্রতি আমার কবিতা জটিল হয়ে

পড়েছে। আমার শেষের দিকের কবিতায় তেমন প্রসাদ নেই। দোষ হোক, গুণ হোক—এ জিনিষ তবু অস্বাভাবিক নয়, এবং কাব্য জীবনের একটি অধ্যায় শুধু ; শক্তি, ইচ্ছা ও সৎ অন্তঃকরণ থাকলে ভবিষ্যতের দিকে হয়তো বা নিয়ে যাব কবিতাকে।"*

॥ দুই ॥

"মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব
থেকে যায় ; অতীতের থেকে উঠে
আজকের মানুষের কাছে
প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে।"

'সাতটি তারার তিমির' রচনার যুগে জীবনানন্দ দাশ তাঁর অভিজ্ঞা ব্যক্ত করে গেছেন এই তিনটি পংক্তিতে। 'চেতনা' মানুষ-মাত্রেরই থাকে। কিন্তু যে-মানব অতীত থেকে উঠে এসে চেতনার পরিমাপ নিতে উৎসুক হন তাঁর উৎকৃষ্ট চিত্তই কবিতা বহন করে থাকে। জীবনানন্দের কাব্যের ইতিহাস চেতনা এই সহজ কথাটি। কাব্য উৎকৃষ্ট চিত্তের বোধ ও বিচার। বুদ্ধেরও এই বোধ ও বিচার ছিল কিন্তু বুদ্ধ কি কবি ? বুদ্ধ কবি নন। বিশুদ্ধ কল্পনা বা বোধি কবির উপাস্য নয় বলে জীবনানন্দ মনে করতেন। সাতটি তারা দিয়ে যে-সপ্তর্ষিমণ্ডল রচিত আর সেই ছায়াময় দিব্যযোনির থেকে যে-সৃষ্টিকল্পনা মানুষের শ্রুতিতে আগত জীবনানন্দ তেমন একটি তমসার প্রতিমানে তাঁর আস্থা স্থাপন করেছেন ক্রমে ('সৃষ্টির তীরে'—কবিতা) পিরামিডের বাস্তব ইতিহাস থেকে গাত্রোত্থান করে ('পিরামিড'—ঝরাপালক)। এই উৎক্রমণের পথে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পার্থিব-চেতনা, 'বনলতা সেন'-এর গাথা-গীতি এবং 'মহাপৃথিবীর' দর্শনভঙ্গী তিনটি ক্ষণিক স্থির-বিন্দু। তাঁর ইতিহাস-চেতনা জন্মাবধি আর্ষ চেতনায় ধাবিত। সে-ঋষিরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ

* লেখকের কাছে লেখা জীবনানন্দ দাশের চিঠি।

করেছেন, পার্থিব জীবন যাপন করেছেন, মহাপৃথিবীর কুশল-মৈত্রী চিন্তা করেছেন এবং অবশেষে পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে তারার চিহ্নে আকাশে স্থিত বলে ভারতীয় কিম্বদন্তী। 'খানিকটা আলো উজ্জ্বলতা শান্তি' কবি-জীবনের কাম্য ও দেয়। এই কবি-জন্ম 'তবু ভালো', যদিও কয়েকটি সূর্য্যের মুহূর্ত্তমাত্র তার পরমায়ু ('পৃথিবীতে এই'—সাতটি তাবার তিমির), যদিও 'তু'দণ্ড শান্তি' মাত্র 'নাটোরের বনলতা সেন' আজকের দিনে দিতে পারেন কবিকে। অজানার অন্ধকার সমস্ত ইতিহাসের আগে আর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে— জানার আলো বড়ো কম—যতোক্ষণ আর যতোটুকু নানা দৃশ্য জানা যায় প্রদোষে-আলোতে, ততোক্ষণই শান্তি। এ-জানাজানি নর-নারীর কেন্দ্রে ছিল 'বনলতা সেন'-পর্য্যায়ের কবিতা রচনা-কালে। তখন "মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়" ছিল আলোর পথ।

পার্থিব জীবনকে, প্রেমকে অবলম্বন করে সুরু হল ঐতিহ্য-জর্জ্জর এক প্রাণবিন্দুর ক্লান্ত যাত্রা। শ্রান্তি যে-ধরনের শান্তরস এনে দেয় চিত্তে, যে-ধরনের কল্পলোক নির্ম্মাণে ব্রতী করে উৎকৃষ্ট চিত্তকে, জীবনানন্দ 'ঝরাপালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এবং 'বনলতা সেনে'র অধ্যায়ে তা-ই আনয়নে ব্রতী হয়েছেন তিনটি বিদ্যুৎ প্রভায়। সেই আলোকিত পথের দর্শন নির্ম্মাণ করেছেন 'মহাপৃথিবী'-তে। দর্শন-জাত পথে যাত্রী হয়েছেন 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে। তারপব তিনি নিজেকে প্রাঞ্জলতর করবার জন্যে সচেষ্ট হয়েছিলেন একটি 'মহাজিজ্ঞাস।'ব মন্ত্র উচ্চাবণ করে। সে-মন্ত্র সোচ্চাব। তাঁর নির্জ্জন মন নেই—তাঁর উৎকৃষ্ট চিত্ত তরঙ্গ-মুখর। আমরা অহরহ সে-তরঙ্গ ধ্বনি শুনতে পেয়েছি। হয়ত কর্ণপাত করিনি, যেহেতু তাঁর মনের সঙ্গী আমরা ঠিক নই। আমরা সবাই 'লোকেন বোস' যার জার্নাল তিনি স্বচ্ছন্দে ঢুকে গেছেন এবং মন্তব্য করেছেন :

"সেখানে বালির সৎ নীরক্তা ধূধূ
প্রেম নয় তবু প্রেমেরই মতন শুধু।" ('শ্রেষ্ঠ কবিতা')।

ভঙ্গীসর্ব্বস্ব প্রেম এ-যুগের, তবু কবির উৎকৃষ্ট চিত্ত তাকে প্রেম ছাড়া আর-কিছু ভেবে যায়নি। ভাবতে পারতো কামার্ত্ততা, যা বুদ্ধ ভাবতেন বা পিউরিটান জগৎ ভাবত। তিনি কবিচিত্ত বহন করে অন্য ধরনে 'বিনয়ী' হয়েছেন, শুধু বলে গেছেন যে এখানকার চিত্ত বাস্তব মরুভূমি। বাস্তব মরুভূমির বা 'তাতল সৈকতে'র নীরবতা নিয়ে এ-চিত্ত বড়ো একা। তাঁর এই দর্শনের সুর আমরা 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে'র কবিতায় পাব। হাজার হাজার বছর আগে বাঙালী কবি ঠিক এই আকূতি জানিয়ে গেছেন :

"তরুণ তরণি তবই ধরণি
পবন বহ খরা
লগ ণহি জল বড় মরু-থল
জণ-জীবন-হরা।"

থর-মরুর 'বিদিশা'র বিদেশিনী তরুণীর দিশা জীবনানন্দ প্রাকৃত হৃদয়সত্তা আবিষ্কার করতে পেরেছিল, যেহেতু মরুর ঐতিহ্য বহন করে বেড়াচ্ছে সৎ বাঙালী। নাবিক হয়েও তার ভ্রমণের ক্লান্তি দূর হল কই ? বাঙালী হৃদয়ের যাযাবর-বৃত্তি দুরারোগ্য। স্থিতি নেই মানসিক সত্তার।

'হাওয়ার রাতে' জীবনানন্দ অনুভব করেছেন :

"আমার হৃদয় পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেল
নীল হাওয়ার সমুদ্রে স্ফীত
মাতাল বেলুনের মতো গেল উড়ে।"

এই গতি সুর-রিয়্যালিস্টের দর্শন-জাত চিত্র। ১৯৩৩-এ Rene Magritte এই বেলুনের চিত্রটি এঁকেছিলেন, যে-বেলুন প্রস্তর-যুগের ভগ্ন শ্রীমূর্ত্তি মাটিতে ফেলে শূন্যে উধাও। জীবনানন্দও তাঁর বেলুন-হৃদয়ের মূর্ত্তি এঁকেছেন, যে-হৃদয়ের উপলব্ধিতে 'পৃথিবী কীটের মতো মুছে গিয়েছে…'। তবে এসিরিয়া-মিশর-বিদিশার রূপসীরা এখানেও তাঁর হৃদয়ে Rene Magritte-র চোখে দেখা

পাষাণী মাত্র নয়। তারা আকাশের সীমানায় প্রাণময়ী হয়ে প্রতিভাত। 'মহাপৃথিবী'র সিন্ধুসারসের দৃষ্টিতে তারা 'মাছি'। এ-দর্শন পিকাসোর সুর-রিয়্যালিজ্‌মের অধ্যায়-জাত মনের দর্শন।

সুর-রিয়্যালিজ্‌ম বাস্তবতাকে ছেড়ে ঊর্দ্ধগামী হয় বা বাস্তবতার খণ্ডিত অভিজ্ঞতাকে সূত্রান্বিত করতে সচেষ্ট হয়। ইতিহাস-চেতনা বা ইতিহাসের দর্শন মনে সক্রিয় থাকলে যে জাগ্রত স্বপ্ন রচনা করা সম্ভবপর সুর-রিয়্যালিস্ট শিল্পীর শিল্পোপাদান সেই স্বপ্ন। বিশুদ্ধ কল্পনা তা নয়। মানুষ বিশুদ্ধ কল্পনা কখনো করতে পারে কি না সন্দেহ। একাধিক বিরোধী সত্তার বা বস্তুব বা ভাবেব যোগ-সাধন করে অদ্ভুত রূপ সৃষ্টি করা মাত্র মানুষের সাধ্য। জীবনানন্দের ভাষায় এই সৃষ্টির সংজ্ঞা হল: "এক ধরনের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস" (ভূমিকা —'শ্রেষ্ঠ কবিতা')। অবচেতন মনের অভিজ্ঞতা হতে তাব বাধা নেই, যদি মন উৎকৃষ্ট স্তরে উন্নাত থাকে। ঊর্দ্ধে আকর্ষিত চিত্ত বা উৎকৃষ্ট চিত্ত বাস্তব অবস্থাকে উপরের দিকে আকষণ করতে আর্য ধরনই দেখায়। সে-ধরনে যে শুধু শুভই রূপ ফেলে, অশুভ রূপ দেখায়না তা নয়। তবে অশুভকে বর্জ্জন করবার পাণপণ চেষ্টা চলে সে ধরনেব যাত্রাপথে। কবি যাত্রাটাকেই সৎ বা শুভ মনে করেন। 'যাত্রা'-র পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন জাবনানন্দ 'শ্রেষ্ঠ-কবিতা'র 'যাত্রী' কবিতায়। কালো আলো দু'টি দিক টানছে সে যাত্রাকে। এ-আকষণে সম্প্রতি, মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, একটি জিজ্ঞাসা তিনি মনে বহন কবেছেন: সত্যের মুখের রঙ কি? শেষটায় 'অবিনশ্বর' কবিতায় বলেছেন:

"তবুও মহাজিজ্ঞাসা ও অপার
আশার কালো
অকূল সীমা আলোর মতো;
—হয়তো সত্য আলো।"

জিজ্ঞাসা ও আশা কালো রঙে বসবাস করেও যখন আলোর

বলয়িত আভা বিকীর্ণ করে, তখন আলোই সত্য। আলো মানে জ্ঞান-বিজ্ঞান। কিন্তু বিজ্ঞান মানসিক ও মানবিক হওয়া চাই। সেই মানবিক আলোর খবর শেষদিককার কবিতায় যা, তা হল কবির 'চেতনার বলয়ে'র 'নিজ গুণ'। কখনো তা 'ইতিহাসের গভীরতর শক্তি ও প্রেম' যা হৃদয়ে অধিবাসিত, কখনো বা "চোখ রেখে নীলাকাশে শুয়ে থাকা পৃথিবীর মাধুরীর অন্ধকার ঘাসে"। মাধুর্য্য ও শক্তি মিলিত হয়ে যে শক্তিসম্পন্ন মধুর রসায়ন তৈরী করে চেতনায়, জীবনানন্দ আজীবন তা পান ও পরিবেষণ করে গেছেন। এই স্বকীয়তায় উজ্জ্বল করে একটি সহজ সরল চিত্র আঁকতে মাত্র শুরু করেছিলেন তিনি, কিন্তু বর্ত্তমানের ক্রূর ইতিহাস-দেবতা তাতে রাজী হলেন না।

কিন্তু এখনকার বাংলা-কবিতার লেখক ও পাঠক হয়ত জীবনানন্দের স্বকীয় মাধুর্য্য ও শক্তি উপলব্ধি করতে বিশেষ বাধা প্রাপ্ত হন না। জীবনানন্দ আবিষ্কৃত হয়ে গেছেন। এসিরিয়া-মিশর-বিদিশার পাথর সরিয়ে ধ্বনি-ব্যঞ্জনার (ব্যঙ্গ্য) পথে যে-চিত্রাবলী তাঁরা জীবনানন্দের রোমান্টিক কবিতাগুলো থেকে মনে তুলে এনেছেন, তাতে তিনি অনেকাংশে অনুভূত বলে মনে হয়। তিনি ক্রমেই প্রিয় কবি হয়ে উঠেছিলেন, জনপ্রিয় যদিও হননি। জনপ্রিয় হতে হলে যে প্রাঞ্জল রূপ ও রস বিতরণ করতে হয়, তা তিনি কোনোদিন করতে পারতেন বলে আমরা ভাবতে পারিনে। সুতরাং মনোভঙ্গীকে তিনি প্রাঞ্জলভাবে ব্যক্ত করলেও, তাঁর প্রাঞ্জলতা জনসাধারণের নাগালের বাইরেই থাকত।

জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব কাব্য-ভাষায় কারুকর্ম্মে। তাঁর কাব্য-ভাষা বহুল-পরিমাণে অনুকৃত হয়েছে। উপমারই অনুকৃতি শুধু নয়, বাক্যের ধরনও বহু তরুণ কবি আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে জীবনানন্দকে তাঁর প্রাপ্য গৌরব দান করেছেন। কবির কাব্য-বিষয়-চেতনা বলবার ভঙ্গীকে নিয়ন্ত্রিত করে। জীবনানন্দের

চেতনার যাঁরা শরিক হতে পেরেছেন, তাঁরা আজ কবিতা লিখতে গেলে জীবনানন্দের বাক্য-ভঙ্গী অনুকরণ করতে স্বভাবতই বাধ্য হবেন। তাঁরা বুঝতে পারবেন, এ-ধরনের কবিমন আজকের দিনে দুর্লভ অথচ কবিমনের ভাষা আজকের দিনের ভাষার কতো নিকট আত্মীয়! জটিল চিন্তাকে সহজ ভাষায় যতোটুকু কাব্যাত্মক করা যায় তা তিনি অনেক কবিতায় দেখিয়েছেন। বাংলা ভাষার দুর্ব্বলতা সম্পর্কে যাঁরা অবহিত, তাঁরা জানেন এ-কাজ কতো কঠিন। সম্ভবত আগামী দিনের কবিরা এ-কাজের গুরুত্ব সম্যক্ অনুধাবন করতে পারবেন।

এক শতকের এক-তৃতীয়াংশকাল বাংলা-কবিতায় একনিষ্ঠ চিন্তা হয়ত জীবনানন্দের সমসাময়িকদের মধ্যে আর কেউ করেন নি। তিনি ভবিষ্যতের কবিদের নিকট স্মরণীয় ও বরণীয় হবেন এই মনোভঙ্গীটির দরুণ—এই মনোভঙ্গী আজ কুয়াশা-ধূসর মনে হলেও একসময়ে তা থেকে সূর্য্যালোক বিকীরিত হবে।

এ-ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করবার কারণ এই যে, আমরা আশা করি, তরুণরা ক্রমেই উৎকৃষ্ট চিত্তের অধিকারী হবেন। চিত্তোৎ-কর্ষের দরুণ 'মহাপৃথিবী'র এই 'সিন্ধুসারসে'র কণ্ঠ আজ মুষ্টিমেয় নীলকণ্ঠ পাখী হয়ত খানিকটা ধরতে পেরেছে কিন্তু অনেকটা সুরই অবিদিত রয়ে গেছে তাঁদেরও মনে যেহেতু জীবনানন্দের মতো একটি স্বতন্ত্র 'রিয়্যাল' জগতের বাসিন্দে তাঁরা নন। সুর-রিয়্যালিটি বা সুপার-রিয়্যালিটির জগৎ একদিন যখন অনেক মানুষের অধিগত চিন্তার বাস্তব সত্তা হয়ে দাঁড়াবে, মানুষের ইতিহাস যেদিন তার অবচেতন মনের রাজ্যকে চেতনার আলোতে উদ্ভাসিত দেখতে পাবে, যখন সবরকম আপাত-অস্বাভাবিক বিন্যাস সুবিন্যস্ত করতে পারবে সূত্রান্বিত করে, সেই পরম জ্ঞানের দিনে জীবনানন্দ দাশের কাব্য-কৃতি আরো বেশি হৃদয়গ্রাহী, আরো ব্যাপকভাবে আনন্দ-দায়ক হয়ে উঠবে বাঙালী শিল্প-ভোক্তার সমাজে। হয়ত

একমাত্র সেদিনই তিনি আটপৌরে কবি হতে পারবেন, তার আগে নয়। তাঁর যতোটুকু রিয়্যালিটি ছিল তার জন্যে তিনি এ-যুগের তরুণ-চিত্তে সাড়া তুলে গেছেন কিন্তু তাঁর সুর-রিয়্যালিটি বা ধূসর আলোকে আবৃত উৎকৃষ্ট চিত্তসত্তার অন্তর্গত জগৎ যা 'ধূসর-পাণ্ডুলিপি'র অধ্যায় থেকে সুরু করে 'মহাপৃথিবী'র অধ্যায়ে বাহিত, প্রৌঢ়মনা তরুণদের জন্যে শুধু রয়ে গেল। সে-ধরনের তরুণের সংখ্যায় যতোই বিশেষিত ও বাহিত হয়ে সমাজ-মানস প্রকৃষ্ট হয়ে উঠবে, ততোই শিল্প-ভোক্তার মন বুঝতে পারবে যে "কাঞ্চী বিদিশার মুখশ্রী মাছির মত ঝরে"। ততোই মানুষ জীবনানন্দের মতো হেমন্তশ্রী দেখতে পাবে পৃথিবীর মুখে। হয়ত তখন কেউ বলবে, বিশ শতকের বাংলাদেশে যিনি এক-তৃতীয়াংশ কাল কাব্য-সাধনা করে গেছেন সেই জীবনানন্দ দাশ শীতার্ত্ত ছিলেন বলেই আমাদের রৌদ্র-মাখা দিনে উড়ে এসেছেন। তখন তাঁরা সমস্বরে আবৃত্তি করবেন :

> "সুরঞ্জনা, ওইখানে যেওনাকো তুমি,
> বোলোনাকো কথা ওই যুবকের সাথে ;
> ফিরে এসো সুরঞ্জনা ;
> নক্ষত্রের রূপালি আগুন ভরা রাতে।"

সেদিন 'সাতটি তারার তিমির' হয়ত হেসে উঠবে জীবনানন্দ দাশের কণ্ঠেরই উচ্চকিত হাসির ধ্বনি নিয়ে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

"বৃহত্তর সত্তার জন্য ব্যাকুলতা যদি এদের ভেতর থেকে না জাগে তাহলে বাইরে থেকে টেনে ঠেকা দিয়ে কতক্ষণ রাখা যাবে ?······আমি সেই মামুলী সত্যে বিশ্বাস করি যে, মানুষের সত্যকার মুক্তি তার নিজের ভেতরকার প্রেরণা ছাড়া আসে না—আমি চাই ওই বীভৎসতা, ওই পঙ্গুতা ও অন্ধতা সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে' তুলে বিপুল অসন্তোষ তাদের মনে রোপণ করতে। বৃহত্তর সত্তার ব্যাকুলতা সেই অসন্তোষ থেকেই আসবে বলেই আমার বিশ্বাস।······দেহের শ্রমের পরিবর্ত্তে ওরা যা পায় জীবন নির্ব্বাহের পক্ষে তা যথেষ্ট নয় তা আমি জানি এবং ওদের মানসিক ও নৈতিক দৈন্য যে আর্থিক দৈন্যর ফল তাও আমি জানি।······পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সত্যকার আর্থিক স্বচ্ছলতা যে বর্ত্তমান সমাজ-গঠনের শুধু সংস্কার নয়, আমূল পরিবর্ত্তন না করলে হবে না, সে কথা নূতন করে প্রমাণ করবার জন্যে Socialist, Anarchist, Syndicalist-এর যুক্তির পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন মনে করি। এই আমূল পরিবর্ত্তন অবনত মানব সমাজের সত্যকারের জাগরণ ছাড়া কি সম্ভব ?"

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' উপন্যাসের অশান্ত কর্ম্মকারের এই কথাগুলো কতগুলো সাজানো কথা মাত্র নয়। এ-ধরনের চিন্তা প্রায় চল্লিশ বছর আগে বাংলাদেশের ভাব-রাজ্যে এসে সত্যি উপস্থিত হয়েছিল। সে-সময় জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে ভারতবর্ষ উদ্দীপ্ত আর তার সঙ্গে এসে মিশেছে রুশ-বিপ্লবের ধ্বনি—মানবের মুক্তির বাণী-বাহক। মুক্তির এই অপূর্ব্ব ধ্বনি সেদিনের বাংলা কবিতায় প্রতিধ্বনিত না হয়ে যায়নি। একটু পেছনে চোখ ফেরালে আজও তার চিহ্ন পাওয়া যাবে নজরুল ইস্‌লাম এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের তখনকার কাব্য-সাধনায়। অবনত মানুষের সমাজকে কবিতার উপজীব্য করে তোলা তার আগে কোনো বাঙালী কবির পক্ষে সম্ভব

হয়নি। হয়ত কাব্যে সৌন্দর্য্যহানির সম্ভাবনায় বাঙালী কবিদের হৃদয় সেই পঙ্কিল জীবনকে কাব্যের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেছে। বাংলা সাহিত্যের 'অতি আধুনিক' আন্দোলন সাহিত্যের এই শুচিতার আতিশয্যকেই আক্রমণ করবার চেষ্টা করেছিল। 'অতি-আধুনিক' সাহিত্যিকরা আর কিছু না করুন—সমাজের বীভৎসতা, পঙ্গুতা ও অন্ধতা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে দেবার একটা সজ্ঞান চেষ্টা তাঁদের অনেকেরই ছিল। কিন্তু কবির ধর্ম্ম শুধু মানুষকে সচেতন করে দেওয়াই নয়, মুক্ততর জীবনের জন্যে মানুষের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলাই তাঁদের হৃদয়ের ধর্ম্ম। তাই সেদিনের সার্থক কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' কবিতা-বইটির পাতায় পাতায় 'অবনত মানব সমাজের সত্যকারের জাগরণ' ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

কেবল রাষ্ট্রিক বা সামাজিক কতগুলো মতবাদ নিয়ে কেউ কবি হয়ে উঠতে পারেন না। কবির জীবনের সঙ্গে যদি তেমন কোনো মতবাদের সামঞ্জস্য থাকে তবেই কবিতায় আমরা একটা বলিষ্ঠ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করতে পারি। মতবাদের শুক্‌নো খোলসে কাব্যের চেহারা যা হয়ে ওঠে তাতে মনে একটা অভিনব বোধ তৈরী হওয়া দূরে থাক্, মেজাজ বিগ্‌ড়ে যায়। মানুষের মুক্তির কথা আজ পর্য্যন্ত ধর্ম্মে, দর্শনে, বৈজ্ঞানিক বা রাষ্ট্রিক মতবাদে অনেকভাবেই বলা হয়েছে। তাকে কবিতার বিষয় করে নিতে হলে কবিকে শুধু সেই মতবাদে আস্থাবান হলেই চলবে না, পুঁথির মারফত মানুষকে চিনলে চলবে না, হৃদয় দিয়ে সমস্ত মানুষকে চিনে নিতে হবে। কাব্যবস্তুকে কবি পঞ্চেন্দ্রিয়ের পথে জানেন না, জেনে নেন হৃদয়ের পথে যাকে বলা যায় ষষ্ঠেন্দ্রিয়। মানুষের প্রতি এই হৃদ্যতা যার নেই, মানুষকে নিয়ে কবিতা রচনা তার পক্ষে বিড়ম্বনারই নামান্তর। উনিশ শতকে ইংরেজী কবিতায় একমাত্র ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যানই এই হৃদ্যতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথে এই হৃদ্যতার অভাব

নেই, কিন্তু ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টি নিয়েই রবীন্দ্রনাথ মানুষের দিকে তাকিয়েছেন। অবনত মানুষের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা ছিল এজন্যে —তিনি উপলব্ধি করতেন, এক আনন্দ থেকেই সর্ব্বভূত জন্ম নিয়েছে। অবনত মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নাড়ীর সম্বন্ধে তাদের চিনে নেওয়া আলাদা জিনিষ। তাদের সম্বন্ধে লরেন্সের ভাষায় 'Blood-Knowledge' একমাত্র প্রেমেন্দ্র মিত্রের অনুভূতিতেই আমরা দেখতে পাই। সে-অনুভূতিতে কবি তাঁর সত্তার পার্থক্য ভুলে যেতে বাধ্য। 'অবনত মানবে'র সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে তাঁর আর কোনো দ্বিধা থাকে না। ঘরের বন্ধন, শ্রেণীগত স্বার্থের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে তিনি পৃথিবীর বিপুল জন-সাধারণের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে এসে দাঁড়ান। তাই ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান বলেন :

I am enamoured of growth out of doors
Of men that live among cattle or taste of the ocean or woods
Of the builders and steerers of ships and the wielders of axes and
The drivers of horses

শ্রমিকের জীবনের সঙ্গে মিতালি করে সে-জীবন সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা জেগে ওঠে :

We primaeval forests felling
We the rivers stemming, vexing we and piercing deep the mines within
We the surface broad surveying we the virgin soil up-heaving
....
........not for us tame enjoyment.

প্রেমেন্দ্র মিত্রও উপলব্ধি করেন 'ঘরের দেওয়াল' 'ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। তাই বলেন:

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের
মুটে মজুরের
—আমি কবি যত ইতরের।

*   *   *   *

কামারের সাথে হাতুড়ি পিটাই
ছুতোরের ধরি তুরপুণ,
কোন্ সে অজানা নদী পথে ভাই
জোয়ারের মুখে টানি গুণ।
পাল তুলে দিয়ে কোন্ সে সাগরে
জাল ফেলি কোন্ দরিয়ায়
কোন্ সে পাহাড়ে কাটি সুড়ঙ্গ
কোথা অরণ্য উচ্ছেদ করি ভাই
—কুঠার ঘায়। (প্রথমা)।

কর্ম্মশীল শ্রমিক-জীবনের বিস্তৃত পরিধি সম্বন্ধে প্রেমেন্দ্র মিত্রও সচেতন:

তপতী কুমারী মরু চাহে আজ প্রথম পায়ের ধূলি
অজানা নদীর উৎস ডাকিছে ঘোমটা আধেক খুলি।
নিসঙ্গ গিরিচূড়া
তুহিন তুষার-শয়নে আমারে স্মরিছে বিরহাতুরা।

*   *   *   *

সোহাগের ভাষা কখন শিখি যে নাই মোটে অবসর।
(প্রথমা)।

শ্রমিকের জীবনের শরীক হয়ে সভ্যতার সত্যকার মানে কবির দৃষ্টিতে পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। তিনি বুঝতে পারেন মানুষ প্রকৃতির দাস নয়, প্রকৃতিই মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে উৎসুক:

মাটি মাগে ভাই হলের আঘাত
সাগর মাগিছে হাল
পাতাল-পুরীর বন্দিনী ধাতু
মানুষের লাগি কাঁদিয়া কাটায় কাল। (প্রথমা)।

এ-জীবনধারার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চললে স্বাভাবিক-ভাবে জড়বাদী দৃষ্টি এসে যায় কবির চোখে। মানুষকে তিনি কোনো অপার্থিব ভাব-রূপের বস্তু-দেহ বলে ভাবতে পারেন না। মানুষকে বলেন:

মাটির ঢেলা মাটির ঢেলা
ডাক্‌ছে তোরে তোর মাটি— (প্রথমা)।

যদি দেবতা বলে কিছু থেকে থাকে তবে মানুষই তা-ই। তার জন্যে কবি কল্পস্বর্গলোক হাতড়ে বেড়ান না:

দেবতার জন্ম হ'ল।
দেবতার জন্ম হ'ল সুপবিত্র সুন্দর প্রভাতে
মাটির কোলের পরে—
মার বুকে…… (প্রথমা)।

কিন্তু এ-দেবতার সম্মান আমরা করতে পারিনি—অবহেলায়., অশ্রদ্ধায়, নির্য্যাতনে:

বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে
কাঁদে কোটি মার কোলে অন্নহীন ভগবান মোর। (প্রথমা)।

আমাদের চোখে স্বপ্ন আছে, মিলনের ছন্দ অজানা নেই, আমরা সৃষ্টি করেছি ভালোবাসা তবু তা থেকে আমরা ভ্রষ্ট। 'মাটির ঢেলা' পৃথিবী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ঘুরছে—তারই সন্ততি আমরা, তাই হয়ত

লক্ষ্য ভুলে গেছি 'আদি পঙ্কের ঋণ' আমাদের শোধ করতে হয়, তাই—

রাখীবন্ধনে বাঁধিব যাহারে তাহারে পরাই বেড়ী,
—সে মোর আপন ভাই।
জীবন যাহারে ঘিরি গুঞ্জরে, তারি সূর্য্যের আলো
দুই হাতে আগলাই। (প্রথমা)।

শুধু তা-ই নয়। লোভের বিবেকহীন তাড়নায় আজকের দিনের মানুষ যে কতোটা স্বার্থপর হয়ে উঠেছে তার সীমা নেই। পেশীতে আর ঘামে যারা গড়ে তুলছে মানুষের সভ্যতা তাদের জীবনের প্রতি এতোটুকু কৃতজ্ঞতা আমাদের নেই। তাদের দিয়ে যখন আর আমাদের কাজ চলে না, ভাঙা জাহাজের মতো তখনই তারা বাতিল—বেকার :

দুনিয়ার কড়া চৌকাদারী যে ভাই
হুঁসিয়ার সদাগরী,
হালে যার পানি মিলে না কো আর, তারে
যেতে হবে চুপে সরি! (প্রথমা)।

মানুষের অবিচার আর লোভই যে সমাজে পঙ্কিল জীবন সৃষ্টি করে চলেছে, সমাজ-সচেতন কবির মনে এ-নিয়ে আর প্রশ্ন থাকতে পারে না। কবি মানুষের অপরাধকে সামাজিক অপরাধ বলেই মনে করেছেন, আর তাই চেয়েছেন নিজেকেও অপরাধীর দলভুক্ত করে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সেই কলঙ্কিত, অবনতদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। 'জীবন-বিধাতা'কে তিনি আর সৌন্দর্য্যমুগ্ধের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাতে পারেন না :

জীবন-বিধাতা, আজি বিদ্রোহীর লহ নমস্কার !
লহ এই প্রীতিহীন প্রণিপাতখানি।

নশ্বর মৃত্তিকা গেহে,
জর্জ্জর তৃষিত দীন, যত নরনারী,
ধূলির মলিন অঙ্কে ধূলিসম শেষে,
বিদায় লইয়া গেল
গোপনে ফেলিয়া অশ্রুবারি ;
তাহাদের সব ব্যথা, সব গ্লানি, জ্বালা, অভিশাপ,
পাপ, তাপ, লজ্জা, ভয়, কুণ্ঠা ও ক্রন্দন,
প্রতি ক্ষুদ্র দিবস-রাত্রির ঘৃণিত জীবন যাত্রা—
কলঙ্ক, হতাশা আর কদর্য্য কলুষ
সযতনে করিয়া চয়ন
এ মোর প্রণামখানি করিনু বয়ন। (প্রথমা)।

'জীবন-বিধাতাকে' বিদ্রোহীর নমস্কার জানিয়েই জনমানসের কবির কর্ত্তব্য ফুরিয়ে যায়না। লক্ষ লক্ষ 'নিঃসম্বল মানবের' হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত না করে তিনি পারেন না। কবি শুনতে পান, জনতা আজ জননায়কের আবির্ভাব চায়—যিনি তাদের মুক্তির সন্ধান দেবেনঃ

দ্বার খোলো হে প্রহরী,
আনো নব উষালোক,
সঞ্জীবিত কর আজ নূতন অমৃতে,
নব-সৃষ্টি-গুঞ্জন-মুখর, ধরাতলে জন্ম দাও। (প্রথমা)।

নব-সৃষ্টি-গুঞ্জন-মুখর নূতন উষার উদ্বোধন সম্বন্ধে কবি নিঃসন্দেহ।

তাঁর এ-আশা ভাবপ্রবণতা থেকে আসেনি, সমাজ-বিজ্ঞানের ধারাতেই তাঁর আবেগ ছুটে চলেছে :

> যত গ্লানি মানবের হতেছে সঞ্চয়
> সেই অশ্রু-প্লাবনের ভাঙ্গন ধারায়
> মুছে যাবে কোন্ দিন।
> সেই দিন হ'ব শুচি। (প্রথমা)।

অবনত মানুষের মুক্তির চারণ-গান এখানেই এসে শেষ হ'ল। সমাজ কবির কাছে এর চেয়ে বেশি কিছু দাবী করতেও পারেনা। যে পরিকল্পনাকে কবি তাঁর আবেগের রঙে রঙীন করে দিয়েছেন তাকে বাস্তবে পরিণত করার ভার সমাজ-কর্ম্মীর। কিন্তু ভারতীয় সমাজে সে ভাঙা-গড়ার ঢেউ এসে তখন লাগেনি—সামান্য একটু সচেতনতায়, মুক্তির সামান্য একটু ব্যাকুলতায়ই রাষ্ট্রিক বা সামাজিক আন্দোলনের অবসান হয়েছে। সমাজের পক্ষ থেকে এ-নিষ্ক্রিয়তা কবির মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত করতে বাধ্য। মানুষের দুঃখবেদনা, পাপগ্লানিকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে ধরে নেওয়া ছাড়া তাই আর কোনো পথ তিনি তখন খুঁজে পাননি। মানুষের যদি কেউ বিধাতা থেকে থাকেন, মানুষের ক্ষুদ্রতায়, মানুষের ব্যথাবেদনায় নেমে এসে তাঁর আনন্দময় সত্তা কোনো নূতনতর অনুভূতি সঞ্চয় করে নেয় বলে কবি সান্ত্বনা পেতে চান :

> মোর সাথে পাপী হলে
> বুকে তুলে নিলে মোর তাপ ;
> মোর সাথে দুর্ব্বহ ব্যথার বোঝা স্কন্ধে নিলে তুলে,
> পিশাচ সেজেছ মোর সাথে,
> কুটিল, নির্ম্মম, ক্রূর, নৃশংস, নির্দ্দয়। (প্রথমা)।

কিন্তু এ-সান্ত্বনাতে সমাজসচেতন কবি হয়ত মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ফেলতে পারেন না। তাই এ-কামনাও তাঁর মনে আসে, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ যেন আজকের দিনের গ্লানি থেকে মুক্ত হতে পারে :

পশ্চাতে আসিছে যারা
তারা যেন ধরণীর এ কলুষ দেখিতে না পায় ;
মোদের চোখেব জলে শেষ হোক সব তাপ গ্লানি
শেষ হোক মানব-আত্মাব এই কাতর কাকুতি
আমাদের বেদনায়। (প্রথমা)।

এই বলিষ্ঠ আশাতেই কবি মত্যুকে উপেক্ষা করে 'চির-সবুজ জীবন-তরুর' কল্পনাকে নিজের মনে ঠাঁই করে দিয়েছেন। হুইট্‌ম্যান-এর মতো মৃত্যুর প্রশংসায় স্তোত্র তৈরী করেননি। প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন :

মৃত্যুরে কে মনে রাখে ?
—মৃত্যু যায় মুছে।

কবরের মৃত্তিকায়, অবহেলি অশ্রদ্ধায়
তৃণে জাগে প্রাণ অবিনাশী। (প্রথমা)।

এই প্রাণের স্পন্দন যখন যেখানে থেমে যাচ্ছে—কবি তাতে ব্যথিত হয়ে উঠছেন। নগরীর 'ধূলি-ধূম-ধূম্রজটা-বিভূষিত শিরে' প্রভাতের আশীর্ব্বাদ এসে পৌছয় না, 'আকাশের সুনীল বিস্ময়' আর 'রাত্রির রহস্য' সেখান থেকে নির্ব্বাসিত। তাই কবি বলছেন :

যন্ত্রের চক্রান্ত ভাঙি
ভেদ করি ষড়যন্ত্র লৌহে আর লোভে
আসুক প্রভাতখানি,
— সৌম্য-শুচি কুমার সন্ন্যাসী
হে পতিতা তোমার আলয়ে। (প্রথমা)।

পৃথিবীকে সুন্দরতম রূপে পেতে চেয়েছেন কবি। তাঁর কামনা পূর্ণ হয়নি, কিন্তু নিজের জীবনে তো তিনি সৌন্দর্য্যের অনেক স্পর্শই পেয়েছেন। তারই জন্যে পৃথিবীর প্রতি তাঁর বিরাট আসক্তি :

ফের যদি ফিরে আসি,
আরো আলো চক্ষে যেন আসি নিয়ে
বুকে আরো প্রেম যেন আনি
পৃথিবীকে আরো যেন ভালো লাগে। (প্রথমা)।

অসুন্দরের ভীড়ে পৃথিবীর সৌন্দর্য্যকে এখন আর তিনি ভুলে থাকতে চাইছেন না। ভীষণের ভীষণতার পাশে সুন্দরের সৌন্দর্য্যকে তাঁর মন স্বীকার করে নিচ্ছে :

বাঁজা ডাঙ্গায় লড়াই বাধে, হাজার দাঁতে কামড়ে ছেঁড়ে টুঁটি,
লক্ষ খুনীর খুন চেপেছে, কবন্ধ ধড় খাচ্ছে লুটোপুটি।
আবার কোথায় নিশীথ রাতে প্রদীপ মিটিমিটি
রুদ্ধনিশ্বাস পড়ছে বধূ প্রিয়তমের চিঠি। (প্রথমা)।

সুন্দর-অসুন্দরের পাশাপাশি থাকাই শুধু নয়, পৃথিবীর জীবন-ধারায় কবি লক্ষ্য করেছেন—একদিকে আগুন লেগে আরেক দিক রাঙা হয়ে ওঠে :

আমার মরুর হাহাকারে হিয়া ব্যথা-বিদুর,
তোমাদের দেশে আকাশ হ'ল যে মেঘ-মেদুর
স্নেহ-শীতল !
আমার প্লাবনে তোমাদের তীরে ফলে ফসল। (প্রথমা)।

'প্রথমা'র শেষের দিকের কবিতায় আমরা দেখতে পাই কবির দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিগন্ত ক্রমেই প্রসারিত হয়ে পড়েছে, সমাজ-উপলব্ধি থেকে মন তাঁর ক্রমেই প্রকৃতি-উপলব্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যৌবনের আগ্নেয় দুর্দ্দান্ততা একটি স্নিগ্ধ শান্ত শ্রীতে এসে যেন আশ্রয় খুঁজে নিতে চায়। প্রেমেও তাঁর দুরন্ত আবেগের চিহ্ন নেই, সেখানেও তিনি চান শীতলতারই স্পর্শ ঃ

ধূধূ প্রান্তর তোমার প্রণয়ে হ'ল ছোট প্রাঙ্গন ;
দীপ হতে কবে, বহ্নি আকিঞ্চন।
তব মমতায় ঘিরে,
অসীম আকাশ-তীরে
সীমার ধরণী গড়ি মোরা অক্ষয়।
তুমি আছ তাই গৃহদীপ সনে তারকারা কথা কয়। (প্রথমা)।

যে অখণ্ড সমাজ-সচেতনতা নিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন তাতেই যে তিনি বরাবর নিমগ্ন থেকে গেছেন তা নয়। 'প্রথমা'র যুগেই তাঁর সে অপসরণ লক্ষ্য করা যায়। সমাজ থেকে পৃথক করে তিনি যে নিজেকে আবিষ্কার করেছেন, 'সম্রাট' কবিতার বই-এ তার চিহ্ন সুস্পষ্ট। বলা বাহুল্য যে মানুষকে ব্যক্তিক ও সামাজিক এই দুই সত্তারই দাবী পূরণ করতে হয়। একটি অপরটিকে গ্রাস করে বসলে অসুস্থতার আর সীমা থাকে না। সামাজিক সত্তাকে অস্বীকার না করলেও 'সম্রাটে'র কবিতায় কবি ব্যক্তিক সত্তার দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। মানুষ

তার নিজের মনের সম্রাট। সামাজিক জীবনের দাবী মিটিয়েও এ সাম্রাজ্য তার অক্ষতই থাকা চাই—সমাজের দাবী যদি এ সাম্রাজ্যে হস্তক্ষেপ করে তাহলে মানুষের বিদ্রোহী মন ক্ষেপে গিয়ে সভ্যতাকে মুছে দিতে উদ্যত হয় :

সমবায়ে সুখ আছে আর আছে শান্তি

*   *   *   *

কিন্তু সাম্রাজ্যও যে চাই আমার

*   *   *   *

একছত্র অধীশ্বর আমার সাম্রাজ্যের
সে সিংহাসন থেকে আমায় চেওনা হঠাতে ;
সমবায় সমিতি সেখানে যেন না দেয় হানা,
তাহলেই বাধবে কুরুক্ষেত্র ! ('সম্রাট'—সম্রাট)।

ব্যক্তিকে স্বীকার করে নিলেও, সামাজিক শক্তিকে তিনি অস্বীকার করেননি। জনগণের জাগরণ-শক্তিকে তিনি প্রাকৃতিক শক্তির মতোই স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য বলে মনে করেন। 'পাঁকে'র অবনত মানব সমাজের কথা তিনি ভোলেননি, তার জাগরণ যে অবশ্যম্ভাবী এ-ও তিনি জানেন। জানেন, আজকের দিনে যারা সমাজের উঁচু ধাপে পতিষ্ঠিত উপরে যাবার তাদের আর কোনো সম্ভাবনা নেই :

চওড়া কাঠের সিঁড়ি গেছে উঠে
ঘুরে ঘুরে অনেক উঁচুতে।

সিঁড়ির একটি বাঁকে
টুলের উপর বসে থাকে সশস্ত্র প্রহরী

আর কাঠের টবে
একটি পামের চারা

*　　　　*　　　　*

জানি পামের চারার মধ্যে সঙ্গোপন আছে অরণ্য .
কাঠের টবে একদিন তাকে ধরবে না ;
কাঠের টুলে নিঃসঙ্গ জনতা আছে থেমে
স্তব্ধ হয়ে ,
একদিন তার স্থাণুত্ব যাবে ঘুচে ।
শুধু কাঠের সিঁড়ি
কোনোদিন পৌঁছাবে না আকাশে ।

('কাঠের সিঁড়ি'—সম্রাট) ।

মানুষের নূতন জীবনের জন্যে আকুলতা, মানুষের 'প্রভাত-পিপাসা' যে অফুরন্ত—কবি তা উপলব্ধি করতে পারেন। নূতন অবতারণার জন্যে মানুষ বারবার রক্তপাত করেছে, এখনও তা-ই করে চলেছে কিন্তু 'শুভ্র জ্যোতি পবিত্র প্রভাত' আজও দেখা দেয়নি। তাতেও কবি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহাকুল নন। তিনি বলেন ঃ

তারপর মন্বন্তর শেষে
　　জ্যোতিষ্মান অবতার
　　　　দেখা দেবে কি নূতন বেশে
　　　　—তারই ছবি
ভাবে বসি অভিশপ্ত মানুষের কবি ।

('অবতারণা'—সম্রাট) ।

যে-পথ মানুষের এই শুভ্র ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে আনছে, তাঁর কল্পনা তাতেই লুব্ধ। যদিও অতীত দিনের মধ্য-এশিয়ার

পার্ব্বত্য পথগুলো তাঁকে আকর্ষণ করে, কখনো মধুর অনুভবে ভরিয়ে তোলে হৃদয়, কখনো বা ভয় জাগায়, তবু তাঁর কল্পনা উদ্ভাসিত আরেক পথের উজ্জ্বলতায় ঃ

> স্বপ্ন দেখি সে-পথের
> অস্তাচল উত্তীর্ণ হয়ে আগামীকালের পানে ঃ
> মন যেখানে নির্ভীক,
> বৃদ্ধের চোখে শিশুর বিস্ময়,
> পৃথিবীতে উদ্দাম দুরন্ত শান্তি। ('পথ'—সম্রাট)।

মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই বলিষ্ঠ স্বপ্ন আছে যাঁর চোখে, তিনি মানুষকে দৃঢ়, সবল, প্রাণোচ্ছলই দেখতে চাইবেন। কিন্তু সভ্যতার পোষাক-পরা মানুষের দেহে কোথায় আছে জীবনের দুরন্ত ভঙ্গী? নেই। এমন কি নগরের খাঁচায় পুষে বাঘের চোখ থেকেও আমরা তার অবণ্য-জীবনের দুর্দ্ধষ জীবন-সংগ্রামের উজ্জ্বলতা মুছে ফেলেছি। অরণ্য-জীবনে জীবনের উদ্দামতা তীব্র, হিংসা সেখানে প্রখর, উজ্জ্বল, আব তাই মৃত্যুও রঙীন স্বাদে পরিপূর্ণ। আমাদের জীবনে হিংসা আছে, মৃত্যু আছে কিন্তু তা স্বাদহীন। এখানে

> ·· ··হিংসা বর্ণহীন ক্ষুধা
> বস্তুর প্রবাহ-চক্রে মৃত্যু শুধু দ্বার।
> ('বাঘের কপিশ চোখে'—সম্রাট)।

নগরের প্রাচীর আর শৃঙ্খল আমাদের চেতনাকে যখন স্থবির করে দিয়েছে, জীবনের প্রাণাবেগ বা মৃত্যুর আনন্দ আমরা পাব কি করে? মৃত্যুর রোমাঞ্চকর স্পর্শ এমন কি সৈনিকের জীবনেও আছে। সৈনিকেরা যা জানে আমরা তা জানিনে ঃ

শব আর মানুষের মাঝখানে
জানি নাই কম্পিত মুহূর্ত্ত
একটি স্বপন নাই
মৃত্যুর নগ্নতা ঢাকিবাব। ('আমরা যাইনি যুদ্ধে'—সম্রাট)।

জীবনের আনন্দকে মৃত্যুর অসহ্য আনন্দে মিশিয়ে দেবার শক্তি আছে আফ্রিকাব আরণ্য মানুষের। বমণীর দেহ থেকে জীবন যে আনন্দেব অনুভূতি পায় তাতে যেমন আছে জীবনেব উপর ক্ষয়েব বা মৃত্যুর স্পর্শ, যেমন ছোট ছোট মৃত্যু দিয়ে আমাদের আনন্দ-গুলো তৈরী—তেমনই মৃত্যু সম্পূর্ণতায় রয়ে গেছে আনন্দের সম্পূর্ণতা। তাই আফ্রিকাব মানুষের কণ্ঠে শোনা যায় ঃ

মৃত্যুব মৌতাতে বুঁদ হয়ে গেছি সব
রমণী ও মবণেতে ভেদ নাই। ('নীলকণ্ঠ'—সম্রাট)।

মৃত্যুর এই যে আনন্দ বা আনন্দেরই যে ঘনীভূত রূপ মৃত্যু—রুগ্নতা ফ্যাকাশে সভ্যতা উপলব্ধি করতে পারেনা ঃ

আমাদেব জীবনে নেই জ্বলন্ত মৃত্যু,
সমুদ্র-নীল মৃত্যু পলিনেসিয়ার
আফ্রিকাব সিংহ-হিংস্র মৃত্যু। ('নীলকণ্ঠ'—সম্রাট)

স্তিমিত দীর্ঘ পরমায়ুব সাধনা কবে সভ্যতাকে সুস্থ বা সার্থক করা যায়না। রুগ্ন হয়ে পড়েছে যে-সভ্যতা তার রক্তের সঙ্গে 'মৃত্যু-মাতাল' রক্তের বিনিময় করতে হবে। জাবনে আনতে হবে 'ঝাঁঝালো মৃত্যুর স্বাদ'। আদি প্রাণী 'অ্যামিবা'র মৃত্যু নেই। কিন্তু প্রাণের বিবর্ত্তনে অমরতার ঠাঁই কোথায়? বিবর্ত্তনের পথে প্রাণ মৃত্যুকেই শ্রেয় জ্ঞানে আবিষ্কার করেছে। কল্যাণের দেবতা আমাদের তাই মৃত্যু পান করেছেন ঃ

অ্যামিবারও ত' মৃত্যু নেই।
মৃত্যু জীবনের শেষ সার আবিষ্কার
আর
শিব নীলকণ্ঠ! ('নীলকণ্ঠ'—সম্রাট)*

মৃত্যুর বাস্তবদিকের একটি সুন্দর মানে আবিষ্কার করেও কবি মৃত্যুর কোনো স্থায়ী মূল্য আবিষ্কার করতে পারেন না। 'মৃত্যুরে কে মনে রাখে?'—একথার ধ্বনিই কবির কানে বেজে চলেছে। মৃত্যুই মানুষের সীমান্ত নয়। মৃত্যুর সীমা পার হয়ে উড়তে থাকে পাখীর মতো মানুষের স্বপ্ন আর আশা। তারা

……চলে বিরামহীন
কূলহীন সাগরে সাগরে
যুগান্তর হতে যুগান্তরে
নভোসীমা করিয়া বিস্তার। ('মৃত্যুত্তীর্ণ'—সম্রাট)।

মুক্তির প্রতি আসক্তি প্রেমেন্দ্র মিত্রের মনের একটি উজ্জ্বল রঙ। 'প্রথমা'র যুগের মুক্তির মূল অনুভূতিকে তিনি মন থেকে কখনো নির্ব্বাসিত করেননি। মানুষের স্বপ্ন আকাশের পরিচিত বেষ্টনীতে

* মানুষের মৃত্যু সম্বন্ধে কবির এই ধারণা একটি বৈজ্ঞানিক মতবাদেরই অনুরূপ। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি মানুষের একটি মৃত্যুবৃত্তি আবিষ্কার করে পতঙ্গের প্রদীপ-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তার তুলনা করেছেন। মৃত্যুর অবস্থায় বা জড় প্রাণহীনতায় ফিরে যাবার জন্যে প্রাণীর এই বৃত্তিকে সিগমুণ্ড ফ্রয়েডও সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন যে মৃত্যুর আবেগ প্রাণীর পক্ষে স্বাভাবিক ও শাশ্বত। তাঁর যুক্তিটা এরকম: যদি কোনো ধারণাতীত দিনে কল্পনাতীত উপায়ে জড়পদার্থ থেকে প্রাণের উদ্ভব হয়ে থাকে তাহলে বলা যায় যে প্রাণের সঙ্গে সেদিন এমন একটি বৃত্তিরও জন্ম হয়েছিল যার উদ্দেশ্যই প্রাণকে নষ্ট করে আবার জড়পদার্থে ফিরে যাওয়া। এই মতবাদ নিয়ে ফ্রয়েড বলেন যে মানুষের যৌন আবেগও মৃত্যুরই একটা পথ। কবিও বলছেন: "মৃত্যুর মৌতাতে বুঁদ হয়ে গেছি সব—রমণী ও মরণেতে ভেদ নাই।"

আবদ্ধ হয়ে থাকেনা, ক্রমেই সে-স্বপ্নের কাছে আকাশ তার সীমা বাড়িয়ে চলে। স্বপ্নের এই অবাধ উড়ন্ততায় কবি মুগ্ধ, যেমি সাগর পাখীর উড়ে যাওয়ায় তিনি মুগ্ধ ঃ

সাগর পাখীরা উড়ে চলে তাই,
আকাশের কোনোখানে সীমা নাই।
('সাগর পাখীরা'—সম্রাট)।

সাগর পাখীর অবাধ অভিযানের পিপাসা মানুষেব সচকিত ভাবনাময় জীবন থেকে মুছে গেছে বলে কবি ব্যথিত। আমাদের ভাবনাগুলো বাদুড়ের কালো পাখা মেলে দেয় ঃ

সিন্ধু সারস হায়
তার মাঝে নাই কোনো
জানো না অতল লোনা স্বাদ
আজ রাতে সাগরের শুনতে পাবে না ডাক—
হৃদয়ের কোন দূর তটে।
('আজ রাতে'—সম্রাট)।

আমাদের মুক্ত জীবনের পায়ে যে শৃঙ্খল জড়িয়ে আছে তার জন্যে কবি ব্যথিত হয়েছেন বটে কিন্তু অসুস্থতায় নিমগ্ন হয়ে যাননি। মুক্তির ক্ষণটুকুকে উপভোগ করবার মতো মন তিনি সর্ব্বদাই খোলা রেখেছেন। ক্ষেত থেকে ফসল তুলে আনবার ভাবনাহীন আনন্দময় ক্ষণের স্তোত্র রচনা করতে মন তাঁব ব্যাকুল হয়ে ওঠে, যদিও তিনি জানেন ঃ

কাল পৃথিবীতে ব্যস্ততা জাগ্‌বে শস্য বহনের আর বিতরণেব
আর হায়, লোভের সংগ্রাম। ('শস্য-প্রশস্তি'—সম্রাট)।

কিন্তু আজ তো শান্তি। আজ তো তিনি ভাবতে পারেন ঃ

মাঠের শস্য গৃহে এল,
এল মানবের শক্তি ও যৌবন,
এল নারীর রূপ ও করুণা,
পুরুষের পৌরুষ,
ভবিষ্যৎ মানব-যাত্রীর পাথেয়।
('শস্য-প্রশস্তি'—সম্রাট)।

সামাজিক বিচারে এ-আনন্দের ক্ষণটি হয়ত মিথ্যা। কবিও তা জানেন কিন্তু মিথ্যার আঘাতে স্বপ্নক্ষণটিকে তিনি বিস্বাদ করে তুল্‌তে চাননা ঃ

জীবন-শিয়রে বসি স্বপ্ন দেয় দোল ;
ওরে ব্যর্থ ব্যথাতুর
সে মিথ্যায় মত্ত হয়ে সত্য তোর ভোল (প্রথমা)।

কবি-মনের ধর্ম্ম প্রেমেন্দ্র মিত্রের চোখ থেকে কঠোর সত্যকে আড়াল করে রাখতে চেয়েছে। বিংশ-শতকীয় কবিদের দুর্ভাগ্য যে বিজ্ঞানের সঙ্গে সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁরা শেলীর মতো রোমান্টিসিজমের পথে কবিতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। কেননা শেলীর যুগের বিজ্ঞান আজ অনেক দূরে এসে পড়েছে, কবি-মনের সঙ্গে বিরোধ এখন তার পদে পদে। বিজ্ঞানের দিকে চোখ বুঁজে থাক্‌লে তবু কোনো রকমে কবিদের চলে যায়, কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি উৎসুক যে-কবির মন লরেন্সের মতো তিনি বিজ্ঞানের কঠোর সত্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আনতে বাধ্য। যে অনুভূতিগুলোকে নিয়ে কবি স্বপ্ন রচনা করেন, যাদের আঘাতে হৃদয় তাঁর আনন্দে-বেদনায় উচ্ছল হয়ে ওঠে, তাকে যদি বিজ্ঞান ইলেক্ট্রনের ভাষায় প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দিতে চায় তখন কবি বলেন ঃ

আমার থাক

সমস্ত অঙ্কের এ পিঠে

মিথ্যা মরীচিকার এই ব্যঙ্গ,

নেশার রঙে টলমল

এই মুহূর্ত্ত-বুদ্‌বুদ,

জন্ম, মৃত্যু, প্রেম,

আনন্দ, বেদনা আর নিষ্ফল এই

আত্মার আকুতি। ('তামাসা'—সম্রাট)।

ইলেক্ট্রনের গাণিতিক গন্ধ এড়িয়ে কবির স্পর্শকাতব মন জীবনের অনুভূতিগুলোকে নিয়েই সজাগ থাক্‌তে চায়। হঠাৎ মনে হতে পারে যে এখানে তিনি সাধারণ মানুষের অনুভূতির স্তরে এসেই দাঁড়ালেন। 'প্রথমা'র কবি সম্বন্ধে হয়ত একথা উচ্চারণ করা খানিকটা সম্ভব ছিল, যদিও সেখানে তিনি সাধাবণ মানুষকে জড়িয়ে গড়ে উঠলেও অনুভূতির ক্ষেত্রে অসাধারণই রয়ে গেছেন। সাধারণ মানুষকে যে বলিষ্ঠ সচেতনতার স্তরে নিয়ে উপস্থিত কবানো যায় সে-মনোভাব নিয়েই 'প্রথমা'র কবিতাগুলো তৈরী হয়েছে। 'সম্রাটে'র কবি অসংশয়ে স্বাধীন, মুক্ত মনের প্রতীক। তাঁব মনের স্পর্শকাতরতা এখানে সাধাবণের মনেব চেয়ে ঢের বেশি বিচিত্র ও সূক্ষ্ম ধারায় প্রবাহিত। নগরের জটিল জীবনে, কাজের ভীড়ে যদি তিনি হাওয়ায় কোমলতার স্পর্শ পান, তাঁর মনে হয় কোন দূর বনে বুঝি বৃষ্টি হয়ে গেছে—তারই স্মৃতির সৌরভ এসে মিশেছে এখানে ঃ

মনে পড়ে মনে পড়ে

কোথায় অরণ্য ছিল

সুবিশাল, গহন, গভীর,

সোনালী রোদের সুরা
পান করে ধরণীর
প্রসারিত সবুজ রসনা ! ('কোন্ দূর বনে' —সম্রাট)।

তেম্নি বিনিদ্র রাত্রির অন্ধকারে তিনি অনুভব করেন পৃথিবীর অতীত সভ্যতার স্মৃতির ঢেউ। সময়ের পদধ্বনি শুন্‌তে পান তিনি, যে-সময় অতীতের অনেক চিহ্ন মুছে দিয়ে গেছে ঃ

স্পন্দিত হৃদয়ে
সময়েব পদশব্দ শুনি ;
অবিবাম অশ্বক্ষুর ধ্বনি
কাল-প্রহরীব।
—কতদূর হতে আসে
নিভায়ে নিভায়ে
কত ক্লান্ত সভ্যতাব দীপ,
কত পথ মুছে মুছে,
চির-মৌন হিমরাত্রি বিছায়ে বিছায়ে,
সৃষ্টির ফসল-তোলা নিঃশেষিত নক্ষত্রের প্রান্তরে প্রান্তরে।
('বিনিদ্র'—সম্রাট)।

প্রেম সম্বন্ধেও কবির অনুভূতি এম্নি গভীরে চলে গেছে। গাছ যেমন বসন্তকে ভুল্‌তে পারেনা কোনোদিন—চিরদিনই গাছের পক্ষে বসন্ত নূতন, তেমনই প্রেমও কবির মনে পুরোনো নয় কোনোদিন ('পুরাতন নাম'—সম্রাট)। পৃথিবী বদ্‌লে গেছে অনেকবার কিন্তু 'পুরাতন পর্ব্বতের, সাগরের, অরণ্যের বীজ' অঙ্কুর মেলে চলেছে—এই সৃষ্টির পথ ছাড়িয়ে প্রেমও যেতে পারে না ('পুরাতন বীজ'—সম্রাট)। 'প্রথমা'য় কবি প্রেমের কাছে নিজেকে সঙ্কুচিত করে

এনেছিলেন। এখানে তিনি প্রেমকে তুলে এনেছেন বন্ধনমুক্ত মনের স্তরে, আবেগের সীমাহীন প্রসারিত ক্ষেত্রে :

দিগন্ত-পিপাসা যদি
কিছুতে না মেটে, তবে
এস খুঁজি দুজনার চোখে।
('জাহাজের ডাক'—সম্রাট)।

কূলহীন সমুদ্র
দিগন্তহীন আকাশ
তুমি ত আমার সেই। ('সৌরভ'—সম্রাট)।

তুমি আমার অরণ্য
আমার ঝঞ্ঝাবেগের
প্রশ্রয় ও প্রতিবিম্ব।
('ঝড় যেমন করে জানে অরণ্যকে'—সম্রাট)।

তোমার নয়ন হতে
আজিকার নীল দিন
জীবনের দিগন্তে ছড়ায়। ('নীল দিন'—সম্রাট)।

'প্রথমা'র কবি 'সম্রাটে' জনতার জীবন থেকে পৃথক হয়ে এসেছেন সত্যি—"জীবনের যে ভূভাগে মরুর অধিকার পাকা হয়নি, যেখানে ফুল ফোটে ফল ফলে, সেখানেও কবি বাঁশী বাজাবার বায়না পেয়েছে একথা মনে রেখো—কেবলি দুন্দুভি বাজাবার পালা তার নয়"—'প্রথমা'র কবির প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি 'সম্রাটে'র কবিতাগুলোতে প্রতিধ্বনিত হয়ত হচ্ছে, কিন্তু তবু আমরা বলব যে প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর প্রাথমিক অনুভূতিগুলোকে অচেতনতায় ডুবিয়ে দেননি। মানুষের মুক্তির বা মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন তাঁর চোখ থেকে বিলীন হয়নি। 'প্রথমা'য় যে-বাণী

ছিল তাঁর কণ্ঠে সোচ্চার তা অন্তর্মুখী হয়ে হৃদয়ের অতলে আশ্রয় নিয়েছে, তার লাবণ্যময় স্ফুরণ ক্ষণে ক্ষণে আমরা দেখতে পাই। চারণ-কবি গভীর অনুভূতিশীল কবি হয়ে উঠেছেন। এ তাঁর সত্যিকারের অপসরণ নয়—সংহত, গাঢ় আবেগে নিবিড়-হয়ে-ওঠা। 'সম্রাটে'র পরেকার অগ্রন্থিত কবিতাগুলো থেকেও একটি কবিতা যদি আমরা স্মরণ করি তাতে দেখব যে মানুষের স্তিমিত প্রাণহীন জীবন-ধারণের প্রতি কবির বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। তাঁর ধারণা প্রকৃতি মানুষের জীবনে যে-ইঙ্গিত বহন করে তা শুধু বাঁশী বাজাবার প্রেরণাই দেয় না, দেয় পৌরুষ দেখাবার প্রবর্ত্তনা। বাংলাদেশ নিয়ে তাঁর কবিতায় আমরা পাই ঃ

উত্তরে উত্তুঙ্গ গিরি
দক্ষিণেতে দুরন্ত সাগর
যে দারুণ দেবতার বর
মাঠ ভরা ধান দিয়ে শুধু
গান দিয়ে নিরাপদ খেয়া তরণীর
পরিতৃপ্ত জীবনের ধন্যবাদ দিয়ে
তারে কভু তুষ্ট করা যায়!
ছবির মতন গ্রাম
স্বপনের মতন শহর
যত পারো গড়ো
অর্চ্চনা চূড়া তুলে ধরো
তারাদের পানে ;
তবু জেনো আরো এক মৃত্যু-দীপ্ত মানে
ছিল এই ভূখণ্ডের,
—ছিল সেই সাগরের পাহাড়ের দেবতার মনে
('ভৌগোলিক'—নিরুক্ত পত্রিকা)।

এই মৃত্যু-দীপ্ত জীবনের কবি আজও অম্লান।

বুদ্ধদেব বসু

'কল্লোল' আর 'প্রগতি'র যুগে যে একদল শক্তিশালী তরুণ লেখক বাংলা সাহিত্যে একটা নূতন আবহাওয়া তৈরী করে তুলেছিলেন তাকে আধুনিক অনেক সমালোচকই রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতিক্রিয়া বলে ঘোষণা করে থাকেন। সাহিত্যের প্রতিক্রিয়ায় খাঁটি সাহিত্য তৈরী হতে পারেনা, জীবন উপলব্ধি থেকেই তার জন্ম হয়। কোনো বিশেষ ধরনের সাহিত্যের অনুকরণ বা বিরোধিতা থেকে যে-সব মূল্যহীন রচনা জন্ম নেয়, সাহিত্যের ইতিহাসে তা দিয়ে একটা অধ্যায় তৈরী হয় না। 'কল্লোল' বা 'প্রগতি'র সাহিত্য-আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে একটি অধ্যায় তৈরী করেছে; সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে সে-আন্দোলন মূল্যহীন বা বিফল নয়। এতোটা প্রভাব বিস্তার করবার মতো জীবন্ততা নিয়ে যে সাহিত্যের আবির্ভাব হয়েছিল তার প্রেরণার উৎস জীবন-বোধ ছাড়া আর কিছু হতে পারে বলে আমরা মনে করিনে।

জীবনকে রবীন্দ্রনাথ যে চোখে দেখেছেন বা যে ভাবে পেয়েছেন, যুদ্ধোত্তর যুগের তরুণদের কাছে জীবনের চেহারা ঠিক তেমন ছিল না। একটু অন্যরকম চেহারায়, একটু অন্যধরনের মানে নিয়ে জীবন এসে তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। সে-জীবনকেই তাঁরা রূপায়িত করতে চেয়েছেন সাহিত্যে। সৃষ্টিবাদই তাঁদের সাহিত্য-ধর্ম্ম ছিল, তবে নূতন সৃষ্টিতে ধ্বংসের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু-কে প্রশ্রয় না দিয়ে তাঁরা পারেননি। এই সৃষ্টির ইচ্ছা সবচেয়ে স্বচ্ছ হয়ে উঠতে পেরেছে তখনকার দিনের কাব্য-সাহিত্যে যেহেতু নেতিধর্ম্ম নিয়ে কথাসাহিত্যের কারবার কিছুটা চললেও কাব্য-সাহিত্য তা নিয়ে বাঁচতে পারেনা, কবিতার কাছে হৃদয় আঁকড়ে ধরবার মতো কিছু পেতে চায়।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের তখনকার দিনের কবিতায় যে-জীবনের মূর্তি ভেসে উঠেছে তা এক বিরাট সামাজিক জীবন : এ-জীবন আমাদের চোখের উপর সব সময় ভেসে থেকেও কাব্যে কখনও প্রবেশপত্র পায়নি। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু গ্রহণ করেছিলেন ব্যক্তিরই জীবন, যা ছিল রবীন্দ্রনাথেরও কবিতার উপাদান ; অথচ সেই ব্যক্তির জীবনের দিকে বুদ্ধদেব বসু তাকিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টি নিয়ে। মানুষের জীবনে সুন্দরের দাবীই কায়েম হয়ে থাকতে পারে না, অসুন্দরের দাবীও মানুষকে সমানভাবে মেটাতে হয়। আলডুস হাক্সলি একেই বলেছেন ডক্টর জিকিলের আর মিষ্টার হাইডের দাবী, বলেছেন—আধুনিক জগতে সুস্থভাবে বাঁচবার উপায় এই দুই দাবীর সমন্বয় করা। মিষ্টার হাইডের বা অসুন্দরের দাবীর কথা রবীন্দ্র-কাব্যে উহ্য থেকে গেছে। রবীন্দ্র-কাব্যের আবেগ নির্দ্দোষ, পরিশীলিত এবং অনেক সময় আধ্যাত্মিক, তার উদ্ভব স্থূল রক্তমাংস থেকে নয়—মনের সূক্ষ্মতা থেকে। দেহের স্বাভাবিক কামনার কাহিনীগুলোকে অন্তরালে রেখে উনিশ শতকের ভদ্র, শালীন (মতান্তরে অপলাপী) সামাজিক জীবনেরই ঋণশোধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সমাজ, এমন কি বাঙালীর সমাজও জীবনের এরকম প্রকাশ-ভঙ্গীকে সত্যের অপলাপ বলে মনে করেছে। জীবনের সবগুলো দিক অকপটে স্বীকার করে নেওয়ার নামই আধুনিকতা। বুদ্ধদেব বসুর প্রথম কবিতার বই 'বন্দীর বন্দনা' এই আধুনিকতার নির্ভীক বন্দনার জন্যেই স্মরণীয়।

'বন্দীর বন্দনা'য় আমরা দেখতে পাই একটি কবির জন্ম হচ্ছে, কবি জীবনের কলুষিত কদর্য্যতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন, কুৎসিত পারিপার্শ্বিকে নিজের পাশব সত্তার মুখোমুখি হয়ে তিনি দাঁড়িয়েছেন :

> আমি শুষ্ক নিশাচর, অন্ধকারে মোর সিংহাসন,
> আমি হিংস্র, দুরন্ত, পাশব।

সুন্দর ফিরিয়া যায় অপমানে, অসহ্য লজ্জায়
হেরি মোর রুদ্ধদ্বার, অন্ধকার মন্দির প্রাঙ্গণ।
('শাপভ্রষ্ট'—বন্দীর বন্দনা)।

জীবনের এই বিফলতা—এই পরিচয়ই জীবনের সবটুকু নয়, বিশেষ করে কোনো কবির মনে। প্রাণধারণের পথে নিষ্ঠুরতার অত্যাচারকে বা জৈবিক কামনার দংশনকে স্বীকার করে নিলেও সেখানেই কবি বন্দী হয়ে থাকতে পারেন না, আবিষ্কার করে নিতে হয় তাঁকে সুন্দরের জগৎ যেখানে আছে তাঁর মনের অবাধ, অগাধ প্রশ্রয়। প্রকৃতি-সম্ভোগে কবি মনের সেই মুক্তি খুঁজে নিয়েছেন, নিজের সত্তাকেও তখন তাঁর মনে হয়েছে মহীয়ান ঃ

সুধায় নির্ম্মিত মোর দেহ-সৌধখানি
ইন্দ্রিয় তাহার বাতায়ন
মুক্ত করে রাখি তারে আকাশের অকূল আলোকে।
('শাপভ্রষ্ট'—বন্দীর বন্দনা)।

তাছাড়া প্রেমের স্পর্শেও কবি নিজেকে শাপভ্রষ্ট দেবতা বলে আবিষ্কার করবার সুযোগ লাভ করেছেন ঃ

যার স্পর্শে ক্ষণে-ক্ষণে হৃদয়ের বেদনার মেঘে
চমকিয়া খেলি যায় হর্ষের বিজলী ;—
নেত্রের মুকুরে তার দেখেছি আপন প্রতিচ্ছবি,
দেখিয়াছি কান্তি মম দেবতার মতো অপরূপ।
('শাপভ্রষ্ট'—বন্দীর বন্দনা)।

কবির মন আর প্রেমিকের মন নিয়ে কবি কদর্য্যতার জগৎ থেকে বেঁচে উঠছেন—'বন্দীর বন্দনা'র প্রথম কবিতা 'শাপভ্রষ্টে' সেই বাঁচার ইতিহাসই আমরা দেখতে পাই। প্রেম আর কবিতা

কবির নিজস্ব সৃষ্টি, তার জন্যে প্রকৃতির কাছে হাত পাততে হয়না তাঁকে। প্রকৃতির কাছ থেকে মানুষ যতটুকু পায় তা খুব মহৎ নয়, পশুর পাওয়ার চেয়ে বেশি নয়—মানুষ নিজেকে নিজে মহৎ করে তোলে। 'বন্দীর বন্দনা' কবিতায় কবি সে-কথাই ব্যক্ত করেছেন।

প্রেম-প্রতিভা এবং কবিতা রচনার শক্তি—এ-দুটোকেই বুদ্ধদেব বসু জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে আবিষ্কার করে নিয়েছেন। কবিতা রচনা করবার শক্তি সম্বন্ধে তিনি কেবল সচেতনই নন, অত্যন্ত প্রবল-ভাবে আবেগময় ('কোনো বন্ধুর প্রতি'—বন্দীর বন্দনা)। যৌবনে কবিতা রচনার মূলে অবশ্য প্রেমের উৎসাহই থাকে সবচেয়ে বেশি। ভাষাময় আবেগকেই যদি আমরা কবিতার সংজ্ঞা বলে ধরে নিই, তাহলে যৌবনের কবিতা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই প্রেমের কবিতা হবে—কেননা প্রেমের আবেগই যৌবনকে আন্দোলিত করে সবচেয়ে বেশি। যৌবনের কবিদের কবিতার পেছনে যে একটি নারীর প্রেম কাজ করতে থাকে সে-ঘটনার অকপট স্বীকারোক্তি অচিন্ত্যকুমারের একটি কবিতার পংক্তিতে পাওয়া যায়ঃ "কার কবিতার উৎসের মূলে তুমি চির-উৎসাহ?" ('অমাবস্যা')। প্রেমের আবেগই যে কবিতার প্রেরণা দিচ্ছে, বুদ্ধদেব বসুও তা অকপটে স্বীকার করে যাচ্ছেন। তিনি বলছেন তাঁর কবিতা পাঠকের জন্যে নয়, বর্ত্তমানের বন্ধুদের জন্যে নয়, ভবিষ্যতের 'সপ্তদশী'র জন্যেও নয়—

> তবু যে জাগিছে আজি সঙ্গীততরঙ্গভঙ্গ হৃদয়ের হিম-সরোবরে
> সে শুধু তোমারি লাগি—('আর কিছু নাহি সাধ'—বন্দীর বন্দনা)।

তাই প্রেমই বুদ্ধদেব বসুর মনে ধর্ম্ম হয়ে উঠেছে। প্রেমের ভেতর কোথাও তিনি সামান্যতম গ্লানি খুঁজে পাননি যেমন

পেয়েছেন অচিন্ত্যকুমাব বা জীবনানন্দ দাশ। ক্ষণিক প্রেমের জয়গান করতেও তাঁর মনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই ('ক্ষণিকা', 'মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখান'—বন্দীর বন্দনা), এমন কি প্রেমহীন প্রেমেব অভিনয়কেও তিনি সহ্য করতে রাজী ('অমিতার প্রেম'—বন্দীর বন্দনা)। একথা অসংশয়েই বলা যায় যে বুদ্ধদেব বসুর মতো প্রেমধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্ কবি বাংলা কাব্য-সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত আর কেউ আসেননি।

বুদ্ধদেব বসুর পরবর্ত্তী কাব্যগ্রন্থ 'কঙ্কাবতী'তে তাঁর যে পরিণত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় তা শুধু কবিতার আঙ্গিকে, ভাষায় অথবা কল্পনার সুচারুতায়—বিষয়বস্তুর নূতনত্বে নয়। সেখানেও প্রেমধর্ম্মিতায় তিনি নিষ্ঠাবান্। 'কঙ্কাবতী'র পঁচিশটি কবিতার প্রায় প্রত্যেকটিই প্রেমের আবেগ রূপ পরিগ্রহ করেছে। সে-আবেগ যে সব সময়ই আবর্ত্তের মতো হৃদয়ের মূলগত তা নয়, ক্ষণিকের রঙীন হাল্কা বুদ্বুদের মতোই বরং তা ক্ষণে ক্ষণে হৃদয়ের উপর ভেসে উঠেছে।

পৃথিবীর ব্যস্ত কোলাহলময় জীবনকে অসহ্য মনে করে স্বাভাবিক ভাবেই রোমান্টিক কবিরা একটি অনুভূতির জগৎ তৈরী কবে নেন। ইংরেজী কবিতায় বহু যুগ থেকে এ-ধরনের সৃষ্টি আবম্ভ হয়ে ইয়েট্স এবং ডি লা মেয়ারে এসে তা শেষ হয়েছে। বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ দাশ এ-ধরনের সৃষ্টিতে সার্থক। বুদ্ধদেব বসু রোমান্টিক কিন্তু ব্যস্ত কোলাহলময় জীবনকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি, বরং তাকে সহ্য করেই নিয়েছেন :

> ব্যস্ত এ-পৃথিবী আছে মোর তরে আজিকার মতো ;
> পৃথিবী-মানুষে ভরা, মোর 'পরে সকলের দাবি—
> পৃথিবী—কাজের কল, মোর 'পরে সবগুলি চাকা—
> এই নিয়ে কাটে মোর আজ। ('কখনো'—কঙ্কাবতী)।

এই পৃথিবীর প্রভাব তাঁর রোমান্টিক মনকে প্রভাবিত করে' অনেক সময় বাস্তবের মুখোমুখি করে দিয়েছে। এই বাস্তবতার স্পর্শে তিনি মনস্তাত্বিক হবার সুযোগ পেয়েছেন, বিষণ্ন দার্শনিকতার পথে পা বাড়াননি। বনলতা সেনের চুল দেখে জীবনানন্দের হৃদয় একটি হারানো জগৎকেই স্মরণ করে: "চুল তাব কবেকার অন্ধকার বিদিশাব নিশা"—চুল নিয়ে তাঁর মনে কোনো বকম ইচ্ছা জাগে না; বুদ্ধদেব বসু একটি মেয়ের চুলকে 'একমুঠো জমানো আঁধার' বা 'নিশীথেব মেঘেব মতো' বলেই চুপ করে থাকেন না, তারপর তাঁর ইচ্ছাকে ভাষা দেন:

দন্তাগ্রে কেশেব গুচ্ছ, কাটি তারে তৃণেব মতন,
উরজ পুষ্পেব মত চুল ছানি দুই হাত দিয়ে;
—খস্‌খসে চুলগুলি, তার স্পর্শে নাসিকা স্ফুরিছে,
চুলগুলি পান কবে মোব উষ্ণ, সতৃষ্ণ নিঃশ্বাস।
('চুল'—কঙ্কাবতী)।

বুদ্ধদেব বসুর ইচ্ছা ব্যবহাবিক জীবনেব রঙ দিয়ে তৈরী কিন্তু কবিতা রচনায় এ-ইচ্ছাই তাঁব একমাত্র অবলম্বন নয়, সত্যেন দত্তীয় যুগে কিরণধনেব যা ছিল। এ-ইচ্ছার সঙ্গে রোমান্টিক মনের আবেগের রঙও প্রচুর এসে মিশেছে। ইচ্ছা আব আবেগ নিয়েই বুদ্ধদেব বসুর কবিত৷ স্বতন্ত্র, অভিনব।

হৃদয়ের দুটো পুরোনো সম্পদ—কবিতা আর প্রেম—'কঙ্কাবতী'র যুগে এসে বুদ্ধদেব বসু হারিয়ে বসেননি, বরং এখানে তা আরো পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। কবি একা-একা কথা বলেন, 'হৃদয়ে ফুলের মতো' কবিতা ফুটে ওঠে, আকাশের তারার মতো আর সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো তা'রা অসংখ্য, অজস্র:

> যে-আকাশে তা'রা তারা—যে-সমুদ্রে ঢেউ
> সে-আকাশ আমার হৃদয়,
> সে-সমুদ্র আমার হৃদয়। ('কবি'—**কঙ্কাবতী**)।

তেম্নি মনে-মনে কথা বলেন কবি, যার কাছে কথা বলেন সে আকাশে ঘুমিয়ে আছে আর সমুদ্রের সঙ্গে মিশে আছে ঃ

> যে-আকাশে, যে-সমুদ্রে আছে সে ঘুমায়ে
> সে-আকাশ আমার হৃদয়,
> সে-সমুদ্র আমার হৃদয়। ('কবি'—কঙ্কাবতী)।

এ-কবিকে রোমান্টিকতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে খাঁটি বলে ঘোষণা করা যায়, মনে করা যায় যে তিনি মানসিক ইচ্ছার তরলতা থেকে ছুটি নিয়ে গাঢ় আবেগময়তায় নেমে আস্ছেন। 'সুখান্বেষী', 'কোনো মেয়ের প্রতি', 'অন্য কোনো মেয়ের প্রতি', 'আমার কবিতা (রমাকে)', 'আমন্ত্রণ রমাকে' কবিতায় যে মানসিক ইচ্ছার রূপ ফুটে উঠেছে তা সব ভুলে গিয়ে এ-কবি যে বিশুদ্ধ আবেগ পরিবেশনে দক্ষ হবেন তাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকেনা। আর সত্যি 'আরশি', 'সেরিনাড', 'কঙ্কাবতী', 'মধ্যরাত্রে', 'রূপকথা', 'শেষের রাত্রি' কবিতায় তিনি যে মত্ত আবেগময়তার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রায় উনিশ শতকীয় রোমান্টিক ইংরেজ কবিদের পর্য্যায়ের। এমন কি এসব কবিতার আঙ্গিকও এ-ধরনের ইংরেজী কবিতার আঙ্গিক স্পর্শ করেছে। উদাহরণত বলা যায় যে 'সেরিনাডে'র আঙ্গিক টেনিসনের 'The Ballad of Oriana'-র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এ-ধরনের কবিতাগুলো বাংলা কবিতারই নিজস্ব ধ্বনিতে ধ্বনিময়। এই ধ্বনিময়তার সম্ভাবনা যে বাংলা কবিতায়

ছিল, 'কঙ্কাবতী' পর্য্যায়ের কবিতাগুলোর আগে তা আমরা জানতে পারিনি। আবেগের এতো অসহ্য উচ্ছলতা এর আগে আর কোথাও দেখা যায়নি—প্রেমের অনুভূতিতে নজরুল ইস্‌লামের আবেগও এতোটা তীক্ষ্ণ নয়ঃ

প্রতি মুহূর্ত্ত ফুটে ঝরে যায়, ফেটে মরে যায় ফুলের মতো,
ফুটে ঝরে যায় তোমার নামে ;
রাতের ঘুমের প্রতি মুহূর্ত্ত সুখে ফুটে ওঠে তোমার নামে,
প্রতি মুহূর্ত্ত তোমার নামের শব্দ ফোটে ;
কাজের জোয়ারে, ঘুমের সময়ে তোমার নামের শব্দ রটে—
কঙ্কা—কঙ্কা—কঙ্কাবতী !
কঙ্কাবতী গো ! ('কঙ্কাবতী'—কঙ্কাবতী)।

কতগুলো শব্দের আব কথার পুনবাবৃত্তি করে আবেগের স্রোতকে ভাষায় রূপায়িত করে তোলা বুদ্ধদেব বসুর নিজস্ব সার্থক আবিষ্কার। এ যেন অনেকটা চক্‌মকি ঠুকে ঠুকে আগুন জ্বালানো। বাংলা ভাষার স্বাভাবিক জড়তাকে নিয়ে আবেগের স্রোত তৈরী করতে পারাই কৃতী শিল্পীর লক্ষণ। ইংরেজী পদ্ধতি থেকে এ-প্রেরণা এসে থাকলেও কৃতিত্বের তাতে হানি হয় না।

এ-ধরনেব কবিতাগুলোর আবেগ প্রেমের আকাঙ্ক্ষা থেকেই জন্ম নিয়েছে, প্রেমের স্বাদগ্রহণ থেকে নয়। তাই তাতে স্বপ্নের স্পর্শই বেশি—একটি স্বপ্নের জগৎ তৈরী করতেও কবিকে তাই দেখা যায়ঃ

অনেক ধূসর স্মরণের ভারে এখানে জীবন ধূসরতম,
ঢালো উজ্জ্বল বিশাল বন্যা তীব্র তোমার কেশের তমো,
আদিম রাতের বেণীতে জড়ানো মরণের মতো এ আঁকাবাঁকা

(ঝড় তুলে দাও, জাগাও হাওয়ার ভরা জোয়ার,
পৃথিবী ছাড়ায়ে, সময় মাড়ায়ে যাবো এবার,
তোমার চুলের ঝড়ের আমরা ঘোড়সওয়ার—
কঙ্কা, শঙ্কা কোরোনা। ('শেষের রাত্রি'-- কঙ্কাবতী)।

কিন্তু 'নতুন পাতা'র প্রেমের স্বপ্ন আর নেই ; চরিতার্থতায় প্রেম সেখানে স্বপ্নের কুয়াশা থেকে অনেকটা মুক্ত। চরিতার্থতার আনন্দ কবির মনে রূপান্তর এনে দিয়েছে, সমস্ত দেহ-কোষে এসেছে পরিবর্ত্তন ঃ

নতুন হতেই হবে আমাকে,
আবার নতুন হয়ে উঠতেই হবে জীবনকে।
কী সেই নতুন ? সে তো তুমি,
তুমি, তুমি
আমার অতীতে তুমি ছিলে না,
তুমি ছিলে না বছরের পর বছর জ'মে-ওঠা আকাঙ্ক্ষায় আর ব্যর্থতায়। ('ভবিষ্যৎ বাণী'—নতুন পাতা)।

অথবা

নতুন সুর এসেছে জীবনে
রক্ত জ্বলছে আমার দু'হাতে, লাল আগুনের মতো
কেননা তুমি তাদের স্পর্শ করেছো। ('নতুন দিন'—নতুন পাতা)।

অথবা

আমি এতদিন ধ'রে ম'রে ছিলাম যে আজ
বড়ো আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে প্রাণের এই নতুন জোয়ার।
জোয়ার ! জোয়ার !
উদ্দীপ্ত, উৎসুক বসন্তের মতো,
বসন্তের গাছের মধ্যে সবুজ, সতেজ প্রাণ রসের উৎসাহের মতো
জোয়ার ! জোয়ার ! ('পুনরুজ্জীবন'—নতুন পাতা)।

এই পরিতৃপ্তি কবির চোখ থেকে স্বপ্নের রং মুছে দিয়েছে সত্য কিন্তু আবেগকে শান্ত-সমাহিত করে দিতে পারেনি। চাওয়ার উন্মাদনার চেয়ে পাওয়ার উন্মাদনা তাঁর মনে তিলমাত্র কম নয়। মনের যার প্রাচুর্য্য আছে, ব্যবহারে প্রেম তার কাছে পুরোনো বিস্বাদ হয়ে যায় না; আবিষ্কারের পথ তার কাছে রুদ্ধ নয়; নিজেরই সৃষ্টি ক্ষমতায় সাধারণকে অসাধারণ করে তুলতে পারে সে। বুদ্ধদেব বসুও তা পারেন, তিনি বল্‌তে পারেন: "তোমার একমাত্র গুণ এই যে তুমি মেয়ে" ('যে কোনো মেয়ের প্রতি'—নতুন পাতা)—আর তা নিয়েই তাঁর সৃষ্টির কাজ চল্‌তে থাকে। যে আবিষ্কারক মন জনম অবধি রূপ দেখেও নয়নের তৃষ্ণা মেটাতে পারেনা, বুদ্ধদেব বসু সে-মনেরই উত্তরাধিকারী। সে-মন নিয়েই তিনি সাধারণকে অসাধারণ করে তুলতে পারেন। সাধারণত্ব আর অসাধারণত্ব এ-সব বিশেষণ তো বাইরের বিভূষণ, আমাদের অর্জ্জিত সম্পদ; তাকে বাদ দিয়েও আমরা আছি, আমরা সবাই একই রকম রক্তমাংসের একই রকম আবেগ আর অনুভূতি নিয়ে আছি। জীবনের এ-স্তরে প্রবেশ করেই লরেন্স তাঁর কবিতায় এমন একটা অনুভবের পরিচয় দিয়ে গেছেন যা প্রকৃতিরই মনের। তাই লরেন্স বলেছিলেন, রক্তমাংসের স্পর্শের পরিচয়েই মানুষের সঙ্গে মানুষের নিবিড়তম পরিচয় হয়। বুদ্ধদেব বসুর দৃষ্টিতে আমরা ঠিক এম্নি একটি ভঙ্গী দেখতে পাই:

যদি আমাকে নিতেই হয়, তা হোক
শুধু আমারি জন্যে।
আমি!—যার কোনো নাম নেই, কোনো অভিজ্ঞান কোনো পরিচয়,
যা দিয়ে লোক চিনতে পারে,
যার হৃৎমূলে দপদপ করে জ্বলছে রক্ত
যা দিয়ে তুমি আমাকে চিনবে। ('শেষ অঙ্গীকার—নতুন পাতা)।

ফ্রয়েডীয় আবিষ্কারের ধারায় মানুষকে চিনতে গিয়ে লরেন্স যৌনতাকে যে-পরিমাণে মহিমান্বিত করছেন তা বিশ্ব-সাহিত্যে দুর্লভ। অদ্ভুত তাঁর চেতনার অভিজ্ঞতা যা সাধারণের অনুভবের বাইরে। যদি কোনো আনন্দ থেকেই বিশ্বের জন্ম হয়ে থাকে, তবে তিনি সেই আনন্দকেই ভাষায় রূপায়িত করতে চেয়েছেন। বুদ্ধদেব বসুর 'জন্ম' কবিতাটিও লরেন্সীয় চেতনার অদ্ভুত অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ। যৌনতা এখানে কামাচারে আবদ্ধ নয়, মহিমায় উর্দ্ধগ।

'নতুন পাতা'য় যে কবি মনকেই নূতন করে সৃষ্টি করে নিয়েছেন তা নয়, বলার ভঙ্গীও তাঁর নূতন হয়ে উঠেছে এখানে। এ-বইএর সবগুলো কবিতাই গদ্যের ভঙ্গীতে লেখা। রবীন্দ্রনাথ যখন গদ্য-কবিতার আন্দোলন এনেছিলেন, তখন থেকেই এ-ধরনে কবিতা লিখতে সুরু করেন বুদ্ধদেব বসু। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা থেকে বুদ্ধদেব বসুর গদ্যে লেখা কবিতার ভঙ্গী খানিকটা স্বতন্ত্র। গদ্যকবিতায় রবীন্দ্রনাথ ধ্বনির ছন্দ বর্জ্জন করলেও ভাবের বা আবেগের ছন্দ বর্জ্জন করেননি, তাই তাঁর গদ্যছন্দে সাধারণ কথা বলবার পদ্ধতিতে ভাষার ব্যবহার হয়নি। বুদ্ধদেব বসু এটুকু শৃঙ্খলাও মানতে চাননি ; সাধারণ কথাবার্ত্তা বলবার ভাষা ব্যবহার করতে একটু তাঁর সঙ্কোচ নেই, অনায়াসে তিনি বলতে পেরেছেন : "আজকাল চাঁদ এতো দেরি করে ওঠে যে ঘুমোবার আগে আর তারে দেখতে পাইনে।" এই সহজ সরল উক্তিতে কোনো আবেগের দোলা হয়ত নেই, আর তাই হয়ত একে আমরা কবিতা বলতে চাইব না ; কিন্তু একথার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে যে-মন, তাকে কি আমরা কবিমন বলে স্বীকার না করে পারি ? 'নতুন পাতা' বইটি সম্বন্ধেই একথা বলা যায়। কবিত্ব-গৌরবে বইটির কোনো বিশেষ কবিতাই হয়ত খুব উজ্জ্বল নয়, কিন্তু বইটি শেষ করে আমাদের বলতে হবে, এ-রচনাগুলো যাঁর হাত থেকে বেরিয়েছে তিনি নিঃসন্দেহে কবি।

কবিতার আঙ্গিককে নূতন করে তোলার পেছনে আমরা কবির শিল্পিমনের পরিচয় পাই। কবিতা লেখা যে তাঁর প্যাশন—ফ্যাশন নয়, এ থেকে তা ই প্রমাণিত হয়। মনে হয় কবিতা লেখার পেছনে যথেষ্ট আবেগ কাজ করে যাচ্ছে। প্রেম যেমন তার মনকে নূতন করে তুলেছে, কবিতাও তাঁর কবিমনে নূতন ঢেউ এনে দিয়েছে। 'নতুন পাতা'য় তিনি কবিতা লেখার আবেগ সম্বন্ধে সচেতন, 'বন্দীর বন্দনা'য় যেমন কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন ঃ

আমার আকাশে বাতাসে আশে-পাশে দীর্ঘশ্বাসে, আমার চাওয়ায়
ছোঁওয়ায় আসবি কলোচ্ছ্বাসে উর্দ্ধশ্বাসে, আমার ব্যথায় হতাশায়
হানবি বিদ্যুৎ ভাঙবি আমার বুক। ওরে কথা ওরে কবিতা ওরে
অজস্র অধীর অফুরন্ত ডুবন্ত কলরোল! ('নিজের কবিতার
প্রতি'—নতুন, পাতা)।

তাঁর কবিতার উৎস-মূলে যে প্রেম সে-কথাও তিনি আবার এখানে স্মরণ করেছেন ঃ

একদিন আমার সমস্ত মন পূর্ণিমার সমুদ্রের মতো
উদ্বেল হয়ে লুটিয়ে পড়েছিলো যার পায়ে।
একদিন আমার রক্তের ঢেউ থেকে যে উঠে এসেছিলো শুভ্র
আফ্রোদিতের মতো।
তাকে দেখে মন্ত্রের মতো ধ্বনিময় হয়ে উঠেছিলো আমার কথা,
সেই তো কবিতা। ('নতুন পাতা'—নতুন পাতা)।

'নতুন পাতা'র পাঠকদের মনে একথা বারবারই মনে হতে পারে যে কবির কাছে সংযমের দাম কতটুকু। সংযম বলতে বাক্-সংযমই অবিশ্যি এখানে বোঝায়। কবিতায় যদি সংযমের কোনো

ঠাঁই থেকে থাকে তাহলে বলতে হয় বুদ্ধদেব বসুর কবিতা অসংযমের দোষে দোষী। পাঠকের মনে অনুভূতি সঞ্চার করে দেবার যে দায় কবিতার আছে তাকে বুদ্ধদেব বসু মানতে চাননা। তাঁর আর্ট সম্পূর্ণ নিজের জন্যে, নিজেকে প্রকাশ করবার জন্যেই তাঁর কবিতা। কাজেই, নিজেকে প্রকাশ করতে হলে বাগ্‌বাহুল্য যদি এসেই যায় তাহলে কি ক্ষতি? এ-ধরনের Attitude-এর উপর কটাক্ষ না করেও বলা যায় যে কম কথায় নিজেকে প্রকাশ করতে পারাও কম কথা নয়। বেশি কথা বলার অনেক দোষের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য দোষ এই যে কথার স্তূপ তৈরী করতে অনেক সময় বিপরীতার্থক কথাও ব্যবহৃত হতে থাকে। যেমন একটি কবিতার পংক্তিতে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন: "জীবনে এমন কঠিন কোনো দাম নেই যা আমি তোমার জন্যে দেবনা।" এই প্রতিশ্রুতি দেবার কয়েকটি পংক্তি পরেই আবার বলছেন: "যে-পৃথিবীকে ঘৃণা করি তোমার জন্যেও তাকে সম্মান করতে পারব না।"

বুদ্ধদেব বসুর যৌবনোত্তর কবি-মানসের ছবি পাওয়া যায় তাঁর 'দময়ন্তী' কাব্য-গ্রন্থে। অতীত যৌবনের উত্তরাধিকার নিয়েই নূতন যৌবনের আবির্ভাব হয়, কিন্তু কবি আর এখানে যৌবনোদ্বেল উদ্ধত মন নিয়ে নূতন যৌবনকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছেন না। তাঁর দৃষ্টি এখন শান্ত, বিনীত। কন্যার যৌবনের কথা ভেবে তাঁর মনে হয় যে যৌবন এর দেহের কাছেও স্বর্গের দাবী এনে উপস্থিত করবে, যেমন যুবতী দময়ন্তীর পাণিপ্রার্থী হয়ে তাঁর স্বয়ম্বর-সভায় স্বর্গের দেবতারা উপস্থিত হয়েছিলেন। যৌবনকে স্বর্গের আবির্ভাবে ধন্য মনে করা কবির পক্ষে নূতন নয়, 'বন্দীর বন্দনা'য় যৌবনের স্পর্শে নিজেকে তিনি 'শাপভ্রষ্ট দেবশিশু' বলেই বিশ্বাস করেছেন। সেই শাপভ্রষ্ট দেবশিশু পৃথিবীর জৈব প্রণয়ের দাবী মিটিয়ে শান্ত নিরুদ্বেল জীবনে 'স্বগৃহে স্বরাজ্যে, শান্তির কঠিনতীরে পুনর্জিত স্বর্গের দুয়ারে' ফিরে যায়। এই জৈব প্রণয়ের দাবী কবির

কন্যাকেও পূরণ করতে হবে, দময়ন্তীর মতো সে-ও ফিরিয়ে দেবে দেবতাদের, নলের আকর্ষণই তার কাছে বড় হয়ে উঠবে। 'যৌবনের জাদু স্বর্গ রচে জন্তুব গুহায়'—তবু 'বিবসন, বিশুদ্ধ, জান্তব' প্রণয়কেই সে বরণ করবে: এ তার অতীতের উত্তরাধিকার।

কিন্তু যৌবনের সবকিছুকেই যৌবনোত্তর মনে সত্য আর ভালো বলে মনে হচ্ছেনা কবির। আত্মকেন্দ্রিক যৌবন জীবনকে নিজ স্বার্থের রঙে রঙীন করে দেখতে চায়:

> মনে করে সূর্য্য তারই সম্ভোগের পথের প্রদীপ
> তারার সেনানী তারই রতি-হ্রস্ব রাত্রির পাহারা।
> উদ্ধত সে,
> সামান্য সঙ্কল্প নষ্ট হলে অদৃষ্টের দোষে
> বিশ্বে নিন্দে........ ('দময়ন্তী'—দময়ন্তী)।

যৌবনোত্তর দিনের স্থির নিশ্চিন্ত সত্তা দিয়ে এখন তিনি উপলব্ধি করছেন:

> বিনষ্ট সঙ্কল্প পূর্ণ, সার্থক ধিক্কৃত অনটন
> স্বার্থ-কেন্দ্র চ্যুত বিশ্ব ফিরিছে আদিম মহিমায়। ('দময়ন্তী'—
> দময়ন্তী)।

এ-উপলব্ধি যৌবনে আসেনা; আত্মকেন্দ্রিক ইচ্ছা দিয়ে যৌবন প্রকৃতিকে সাজিয়ে তুলতে চায়, বাজিয়ে তুলতে চায়, এমন কি প্রেমের হাতেও ইচ্ছার শৃঙ্খল জড়িয়ে দেয়। কবি কামনা করছেন এই ইচ্ছার উচ্ছলতা শেষ হোক—পৃথিবী যেন মানুষের ইচ্ছার চক্রে আবর্তিত না হয়। ইচ্ছার, আবেগের ও সম্ভোগের কবির মুখে শ্মশান-বৈরাগ্যের মতো শোনা যায়:

·· ·· ··আমার প্রেমেরে
প্রেমেরেও মুক্তি দাও ইচ্ছার শৃঙ্খল থেকে। ('দময়ন্তী'—
দময়ন্তী)।

কবির সম্ভোগ-কামনা শান্ত বিনীত হয়ে এসেছে সত্য কিন্তু সৃষ্টি-কামনা তাঁর নষ্ট হয়ে যায়নি। 'বন্দীর বন্দনা'র 'কালস্রোত' কবিতায় কালকে তিনি যৌবন-ধ্বংসী শক্তি হিসেবেই গণ্য করে ভীত হয়েছেন ; কিন্তু এখন কালের স্পর্শ তাঁর কাছে কেবল মৃত্যু-শীতলই নয়, সৃষ্টির কারুশিল্পী হিসেবেও কালকে তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন ঃ

হে কাল হে মহাকাল, তোমারি তো
তোমারি তো আমাদের হৃদয়ের উল্লসিত
সৃষ্টির উৎসাহ, আমাদের শরীরের
বসন্ত-বাসনা ·····('হে কাল'—দময়ন্তী)।

এই সৃষ্টির উৎসাহ.জীবনেরই ধর্ম্ম। সৃষ্টির হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারেনা জীবন—যতো বার্দ্ধক্যই তাতে আসুক, যত পুরোনোই সে হোক। এ-উপলব্ধি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় আগেই আমরা পেয়েছি ঃ "তবু আজো পুরাতন বীজ পৃথিবীতে মেলিছে অঙ্কুর··· কোথায় ছাড়ায়ে যাবে এ-সৃষ্টিরে ?" যৌবনের প্রান্তে এসে বুদ্ধদেব বসু অনুরূপ উপলব্ধিই করেছেন ঃ

এই পৃথিবীর
পুরোনো শরীরে আসে বসন্তের দস্যুতার ভিড় ;
কোনো নিদ্রাহীন রাতে
আমারও শরীর যেন মুঞ্জরিত হতে চায়
আকাশে জ্যোৎস্নাতে। ('হে কাল'—দময়ন্তী)।

কবি সৃষ্টির আকুলতা অনুভব করেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সত্যি কোনো বিস্ময়কর সৃষ্টি দিয়ে তিনি কি পাঠকদের আকুল করে তুলতে পেরেছেন? কর্ম্মব্যস্ত জীবনের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে, ছোট ছোট 'বিচিত্রিত মুহূর্ত্ত' ভুঞ্জনেই তাঁর দিন কেটে যাচ্ছে। যে উজ্জ্বল মন বিবর্ণ হয়ে গেছে, এ যেন স্মৃতির মতো তাকে নিয়েই বসবাস করা। মনে একটু ছন্দের স্পর্শ পাওয়া, বসন্তের হাওয়ায় একটু বৈকালিক ভ্রমণের ইচ্ছা, কলকাতার জীবনে হঠাৎ একটা জোনাকিকে দেখে আরাম বোধ, ছোট ঘরে বসে প্রেমকে স্মরণ করে কিম্বা ছোট ছোট হাসি দিয়ে জীবনকে তৃপ্ত রাখার নাম নিশ্চয়ই সৃষ্টি নয়। এ তো সেই ইচ্ছারই প্রকোপ যে ইচ্ছার তিনি ধ্বংস কামনা করেন! এ তাঁর পুরোনো মনেরই প্রেত যাকে আশ্রয় করলে শিল্পীর মৃত্যু অবধারিত।

কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর সৃষ্টি-ক্ষমতার নিঃশেষ মৃত্যু হয়নি। আমরা দেখতে পাই কোনো এক সময়ে নিজেকে ছাড়িয়ে তাঁর দৃষ্টি বাইরের দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। আর সে-দৃষ্টি নিয়ে তিনি 'ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা'র মতো একটি সার্থক কবিতাও সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। আফ্রিকার ছায়াচ্ছন্নতায় কবির কল্পনা এখানে পক্ষবিস্তার করবার সুযোগ পায়নি, কবি লক্ষ্য করেছেন আফ্রিকার বাস্তব জীবনের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে, আফ্রিকার উপর তাঁর শুভ ইচ্ছা মন্ত্রের ধ্বনির মতোই কবিতা সৃষ্টি করেছে :

> হে আফ্রিকা হে গণিকা মহাদেশ
> একদিন তব দীর্ণ বিষুবরেখার
> শতাব্দীর পুঞ্জ-পুঞ্জ অন্ধকার
> উদ্দীপিত হবে তীব্র প্রসব ব্যথায়।
> করো,
> মৃত্যুরে মন্থন করি নবজন্ম কাঁপে থরো থরো
> জয়ধ্বনি করো।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

একটি আন্দোলনের সুফল বা কুফল আন্দোলক-শ্রেণীতে যতোটা ফলাও হয় তার চাইতে বেশি সমন্বিত হয় পরেকার যুগে। পরেকার যুগে যাঁরা বিশিষ্ট রূপে আবির্ভূত হন তাঁদের পরিপাক শক্তি এবং দৃষ্টি প্রখর ও প্রসৃত হতে বাধ্য। 'কল্লোল' আন্দোলনের বেলায়ও তাই হয়েছে। অবশ্য ভিন্ন দৃষ্টি নিয়ে যাঁরা বৈশিষ্ট্য-অভিলাষী তাঁরা খানিকটা সঙ্কীর্ণতায় ও সঙ্কোচে একটি অপরিসর বৃত্তে পরিভ্রমণ করতে সুরু করেন। কবিতার স্রোতকে খণ্ডিত করে দেখবার ইচ্ছা যেমন আমার নেই তেমনই তার অগ্রসরতাকেও হরিৎ-দৃষ্টিতে অদ্বৈত দেখতে চাইনে। অখণ্ড অগ্রসরতা কল্লোলোত্তর কবিদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্তে অতি সুস্পষ্ট।

সুধীন্দ্রনাথের 'নবীন লেখনী' যেদিন প্রথম জাগল সেদিনটি হয়ত গৃহকোণ বিদেশী সাহিত্যে উৎসাহী কবিকে নানা ইন্দ্রজাল দেখাচ্ছিল যার সঙ্গে 'পরিচয়-গ্রন্থী বন্ধন করতে পরবর্ত্তী বহু কাব্য-প্রবণ মন অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু প্রথম দিনে তিনি 'নব অলিখিত লেখনী' নিয়ে জানতেন না 'কী জানি কেমন ভাগ্যলিখন' তার আছে। তাই লেখকের জিজ্ঞাসু মন লেখনীকে প্রশ্ন করেছিল :

> তোমার অন্তরে কভু কি শিহরে
> উঠিবে রণি
> স্ফীত ধমনীর লহুর অধীর
> নাটনধ্বনি।
> তোরে দিয়ে কভু হবে কি রচন
> প্রণয় লিপির ব্যাকুল বচন।

কল্লোল-যুগের চিত্র একথাগুলোতে ব্যক্ত। সুধীন্দ্রনাথ আকস্মিক দৃশ্যপট রচনা করে আবির্ভূত হননি। কল্লোল-অধ্যায়েও প্রশ্নপাত করে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি জানেন লেখকের পথের বাধা 'অশ্রুর নদী, শাসনের শিখা, হিংসার বিষ, যশ মরীচিকা' এবং জানতেন তার দরুণ লেখনীর 'গমনচোর' ভঙ্গীর কথা। তবু যখন লেখনী ধারণ করলেন এই ব্যক্তি, তখন তাঁর মনে এই অঙ্গীকার ঝঙ্কৃত হয়েছিল :

> "জ্বেলে দেবে সহমরণের চিতা
> তোর ও মোর।"

আমরণ লেখকের জন্ম হ'ল সেদিন। তারপর 'অবরুদ্ধ পরাণ পল্বলে' তিনি দেখতে পেলেন 'উন্মাদ শ্রাবণবন্যা ছুটে আসে ভৈরব নিঃস্বনে'।

এখানে আমরা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে লেখনীর কর্ম্মকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করতে পারিনে। ভৈরব নিঃস্বনের কথা শুনেই ভাবতে পারিনে আমরণ কাব্যব্রতধারীর রৌদ্ররসমণ্ডিত রূপ। বস্তুত এ-কবির শ্রাবণের রুদ্রতা রবীন্দ্রনাথের বৈশাখী রুদ্রতাও নয়, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের কলস্বনও নয়। এ-রুদ্রতার রূপ খানকটা ভারতচন্দ্র 'মানসিংহে'র শিবির-ভঙ্গের দৃশ্য আঁকতে বর্ণনা করেছেন। সহজ, প্রাকৃতিক অভিশাপ বলা যেতে পারে তাকে। ভাঙবার বিলক্ষণ চেষ্টা থাকে তার কিন্তু ভাঙ্গে না সহজে ভাঙতে পারেনা। সুধীন্দ্রনাথ বাঙালীর মানসিক শিবির সম্পূর্ণ ভাঙতে পারেননি। তিনি শ্রাবণের মেঘ থেকে স্বীয় মূর্ত্তিকে সংবর্ত্তের মেঘের দৃশ্যে অপসারিত করে বিনম্র হয়ে গেছেন উত্তরকালে।

'অর্কেস্ট্রা'-পূর্ব্ব অধ্যায়ে সুধীন্দ্রনাথের এ-মনোভঙ্গীর ইশারাটুকু পেয়ে আমরা সত্যিকারের কল্লোলোত্তর. যুগের মনোগহনে অবতরণ করতে পারি। সাহিত্যকে নেশার সামিল করতে চাওয়া এক

কথা আর ব্রতকর্ম্ম করা আরেক কথা। সুধীন্দ্রনাথ কাব্যকৃতী। শ্রাবণ-ব্রত তাঁর। প্রস্রবণের অপেক্ষা তিনি করেননি—তিনি জানেন কোন্ মেঘে জল হয় এবং কোন্ মেঘ কী বর্ণের। অতএব 'সংবর্ত'-কালীন মেঘের অপেক্ষায় তিনি কাল কাটিয়েছেন 'উত্তর-ফাল্গুনী'র মারাত্মকতা পার হয়ে। মানুষের ইতিহাসে প্রলয় আসবেই কালাবর্ত্তে। আর্য্যাবর্ত্তে যে এমন প্রলয় বহুবার এসে গেছে মানুষের জীবনে ও সৃষ্টিভঙ্গীতে সে-বিষয়ে তিনি ইতিহাস-অধ্যয়নে যেমন জেনেছেন, দর্শন-শাস্ত্রের মর্ম্ম উপলব্ধি করে যেমন সচেতন হয়েছেন, তেমনই আপন প্রাণ-মন-আত্মার পরিচয়-লিপি গ্রহণ করতে গিয়ে সুপরিজ্ঞাত হতে পেরেছেন। 'অর্কেস্ট্রা' গ্রন্থে সুধীন্দ্রনাথের প্রেমাভিজ্ঞতার চিত্রগুলো মাত্র পাওয়া যায়। শিল্পী সেখানে 'আত্মচিত্র' ও মনশ্চিত্র আঁকতে ব্যস্ত। অভিজ্ঞতারও স্বাক্ষর তাতে বিদ্যমান, যাকে 'মেরিডিথ'-কাব্যাদর্শ বা বৌদ্ধ নৈরাশ্য বলা যায়। 'হৈমন্তী' কবিতায় তার শুরু ঃ

> "বৈদেহী বিচিত্রা আজি সঙ্কুচিত শিশিরসন্ধ্যায়
> প্রচারিলো আচম্বিতে অধরার অহেতু আকূতি।"

মধুসূদন দত্তের ক্রিয়াপদ ব্যবহারে সঙ্কোচ নেই 'নবীন লেখনী'র, কেননা তিনি আপন হৃদ্‌গত শক্তিমত্তার অভূতপূর্ব্ব পরিচয় লাভ করেছেন। শব্দের আসল কথা যে পদধ্বনির চরিত্র সুভাষিত করা তা তিনি নিশ্চিত জ্ঞানে উপলব্ধি করেছেন। 'প্রচার' যদি সক্রিয় হতে চায় তাহলে তাকে ক্রিয়াপদের বেশ পরালে ভাষা পঙ্গু বা প্রাচীনতাদুষ্ট হয়না। কবি এখানে নূতন বার্ত্তা প্রচার করতে অগ্রসর ঃ যাকে জৈব চেতনাব প্রতীক ভাবা যায়, আত্মপ্রচার করে সে যতোই বিচিত্র হোক বস্তুত তার সত্তা বৈনাশিক ফলদাত্রী। জৈব জীবন লাঞ্ছনায়ও জীবনের জয় ঘোষণা করে। দর্শন-বিচার-

বিতর্ক হৃদয়ের জৈব তাড়নাকে তাড়াতে পারেনা। হয়ত কল্লোল-যুগের দর্শনেও মোটামুটি এই সিদ্ধান্ত ছিল, কিন্তু কল্লোল-যুগের বিশিষ্ট কবি জীবনানন্দ দাশ পুঁথিগত-দর্শনচ্ছুট। সুতরাং জীবনানন্দের 'হেমন্ত'-চিত্র আর সুধীন্দ্রনাথের 'হৈমন্তী' চরিত্র এক নয়। এক সময় জীবনানন্দ বিরক্ত বৈরাগী হয়ে গেছেন রমণীব কদর্য্য অভিজ্ঞতা লাভ করে। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ জ্ঞানবশত সুস্থিব হয়ে বলছেন ঃ

> "জানি, অলজ্জিত বাতে শ্লথনীবি কম্প্র আত্মদানে
> দেয়নি সে মোরে অর্ঘ, খুঁজেছিল বসন্তসখাকে।"

'বসন্তসখা'র আবির্ভাব বুদ্ধ সহ্য কবলেও জীবনানন্দ সহ্য কবতে পাবতেন না। কিন্তু এই মহাপ্রতীক ভিন্ন প্রেমেব জৈব চেহারা কাব্যময় কবা যে কঠিন! নব এবং নারী প্রত্যেকেরই স্বকীয় কামবৃত্ত আছে। কুসুমাধুব সে-বৃত্তের প্রণেতা। জীবনানন্দ নাবীকে নব-জৈবতায় ও নর-শৈবতায় আকর্ষণ কবতে চেয়েছেন। সুধীন্দ্রনাথ নারীস্বাতন্ত্র্যকে আর্য্য বা মোঙ্গোল বিক্রমে পর্য্যুদস্ত করেননি।

কাজেই ভারত-সংস্কৃতির নিকষে ঘসে জীবনানন্দেব চিত্ত থেকে মনোগুণেব আমেজ বেশি পাওয়া যাবে এবং সুধীন্দ্রনাথে পাওয়া যাবে রজোগুণের আবেশ বেশি। রজোগুণের চরিত্রফল 'অর্কেস্ট্রা'র শেষ কবিতার হাহাকারে ব্যঞ্জিত। ইন্দ্রসেনা বা ইন্দ্রিয়সেনা হয়ে ভারতীয় রাজন্যরা যে ফল দান করে গেছেন, আজকেব জীবনে যে তার ব্যতিক্রম হবে—মানবিক অন্তঃকবণেব পটে বুদ্ধের প্রজ্ঞাব পরও তেমন কোনো পট পরিবর্ত্তন হয়নি। সমাজতত্ত্বে যাঁরা মনোযোগী তাঁরা দেখতে পাবেন যে সামন্ততান্ত্রিক মনোবৃত্তিটুকু পর্য্যন্ত ধনতান্ত্রিক পরিবেশে চেহারা পরিবর্ত্তন করতে অনিচ্ছুক হয়, এবং সমাজতান্ত্রিক পরিবেশে ধনতান্ত্রিক ও সহানুধ্যায়ী সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব সুযোগ-সুবিধে পেলেই উঁকিঝুঁকি দেয়। তা থেকে জ্ঞান লাভ করে আমরা

শুধু এ-সিদ্ধান্তেই আসতে পারি যে বহুযুগ আচরিত কতগুলো পদ্ধতি আমাদের মনোভঙ্গী তৈরী করে তোলে। দেশ-বিভেদে বা দেশের অঞ্চল-বিভেদে তার প্রকৃতি আলাদা হতে পাবে, এই মাত্র। প্রেমকামতা ও ধর্ম্মকামতা মানব-সভ্যতার ঊষাকাল থেকে উত্থিত হয়ে অদ্যাবধি মানব-সমাজে ও মানব-মনে অব্যাহত। এই দু'টি মনোভঙ্গীর সূত্রে বিশ্ববন্ধন বা বিশ্বৈকচিত্র দর্শন সম্ভবপর বলে শৈল্পিক কর্ম্মকৃতি অতি স্বাভাবিক ভাবে প্রেমে ও ধর্ম্মে আকর্ষিত হয়। বাঙালীর বৈশিষ্ট্য ছিল এই দু'টি কামতাকে ভক্তিতে এক করে ফেলা। প্রেমের উৎক্রান্তি নিয়ে প্রশ্ন যেমন বাঙালী ধর্ম্মগুরুর তেমনই ভাবনা শিল্পগুরুরও ছিল। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তে জীবনানন্দ দাশ এই উৎক্রান্তির পথ নিয়েছিলেন, যা সুধীন্দ্রনাথ নিতে অনিচ্ছুক। ফলে 'সংবর্ত'-কালীন পট-পরিবর্ত্তনের আশায় তিনি স্থির হয়ে বসেছিলেন। অবশ্য সে-'সংবর্ত' ঘনীভূত করেছিল বিশ্বরাষ্ট্রনীতি গত মহাযুদ্ধের নিনাদ শুনিয়ে। মানুষের বাস্তব ইতিহাসে সুধীন্দ্রনাথ যতো বেশি আশান্বিত, জীবনানন্দের ইতিহাসচেতনা কিন্তু ততো বেশি আশার আশা করে না। সে-ইতিহাসচেতনা আশার সোওয়ারী, এমন এক কুহকিনী আশা, যে কানে-কানে কুহর তুলে চোখের উপর আলোর আর অন্ধকারের মিছিল সাজিয়ে দেয়। জীবনানন্দ স্বপ্নের হাতের জাদুবিদ্যা আপন হাতে তুলে নিয়েছিলেন।

গত যুদ্ধ যখন আমাদের আশ্বিনের আকাশে এলো, তারপর তার বীভৎসতায় জীবনানন্দ জীবনকে কুৎসিত ও কুরূপ ভাববার অবকাশ প্রচুর পরিমাণে পেয়েছেন। কিন্তু 'সংবর্তে'র সম্ভাবনা লক্ষ্য করে কালান্তর-বোধে সুধীন্দ্রনাথের লেখনী 'নান্দীমুখ' লিখে চলেছে এই ভঙ্গীতে :

> "তোমার যোগ্য গান বিরচিব বলে
> বসেছি বিজনে, নব নীপবনে
> পুষ্পিত তৃণদলে।

শবতেব সোনা গগনে গগনে ঝলকে ;
ফুকাবে পবন, কাশেব লহবী ছলকে
শ্যাম সন্ধ্যাব পল্লবঘন অলকে
চন্দ্রকলাব চন্দনটীকা জ্বলে।
মুগ্ধ নয়ান পেতে আছি কান
গান বিবচিব বলে।"

তখনকাব স্নায়বিক যুদ্ধ ভোগ কববাব যাঁদেব বয়েস বা বিবেচনা ছিলনা তাঁবা 'সংবর্তে'ব এই নান্দীমুখ থেকে কতোখানি কাব্যাস্বাদ লাভ কবেছেন বা কবতে পাববেন তা আমাব জানা নেই। কিন্তু আমি সেই সেনাবাজ্যে দাঁড়িয়ে এ-স্তব স্মবণ কবে বলতে পাবি যে তখন যুদ্ধেব প্রতি উদ্দিষ্ট এই গাথাব প্রতিছত্র মনে বোমাঞ্চ জাগাতে পাবত :

"তবু অন্তবে থামেনা বৃষ্টিধাবা
আর্দ্র, ধূসব, বিদেহ নগব
মৎসব প্রেত-পাবা,
প্রকৃতিব লীলা আববি কুহেলীকানাতে,
ইঙ্গিতে যেন চায় অভিযোগ জানাতে ;
তন্ময় ধ্যান ভেঙে যায় তাব হানাতে।
ছায়া-প্রচ্ছদে যাতায়াত কবে কাবা?
কী নাম শুধাই উত্তব নাই
ঝবে শুধু বাবিধাবা॥"

প্রকৃতির হিংস্রতার মতোই ইতিহাসেব হিংস্রতা অধ্যায়ে অধ্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়—যুদ্ধ তেমনি ঐতিহাসিক হিংস্র দুর্যোগ। সুধীন্দ্রনাথ যুদ্ধেব প্রাক্কালে স্থিব কবলেন : "স্বীয় শক্তিতে হবে যোগ দিতে

শুধু এ-সিদ্ধান্তেই আসতে পারি যে বহুযুগ আচরিত কতগুলো পদ্ধতি আমাদের মনোভঙ্গী তৈরী করে তোলে। দেশ-বিভেদে বা দেশের অঞ্চল-বিভেদে তার প্রকৃতি আলাদা হতে পারে, এই মাত্র। প্রেমকামতা ও ধর্ম্মকামতা মানব-সভ্যতার ঊষাকাল থেকে উত্থিত হয়ে অদ্যাবধি মানব-সমাজে ও মানব-মনে অব্যাহত। এই দু'টি মনোভঙ্গীর সূত্রে বিশ্ববন্ধন বা বিশ্বৈকচিত্র দর্শন সম্ভবপর বলে শৈল্পিক কর্ম্মকৃতি অতি স্বাভাবিক ভাবে প্রেমে ও ধর্ম্মে আকর্ষিত হয়। বাঙালীর বৈশিষ্ট্য ছিল এই দু'টি কামতাকে ভক্তিতে এক করে ফেলা। প্রেমের উৎক্রান্তি নিয়ে প্রশ্ন যেমন বাঙালী ধর্ম্মগুরুর তেমনই ভাবনা শিল্পগুরুরও ছিল। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তে জীবনানন্দ দাশ এই উৎক্রান্তির পথ নিয়েছিলেন, যা সুধীন্দ্রনাথ নিতে অনিচ্ছুক। ফলে 'সংবর্ত'-কালীন পট-পরিবর্ত্তনের আশায় তিনি স্থির হয়ে বসেছিলেন। অবশ্য সে-'সংবর্ত' ঘনীভূত করেছিল বিশ্বরাষ্ট্রনীতি গত মহাযুদ্ধের নিনাদ শুনিয়ে। মানুষের বাস্তব ইতিহাসে সুধীন্দ্রনাথ যতো বেশি আশান্বিত, জীবনানন্দের ইতিহাসচেতনা কিন্তু ততো বেশি আশার আশা করে না। সে-ইতিহাসচেতনা আশার সোওয়ারী, এমন এক কুহকিনী আশা, যে কানে-কানে কুহর তুলে চোখের উপর আলোর আর অন্ধকারের মিছিল সাজিয়ে দেয়। জীবনানন্দ স্বপ্নের হাতের জাদুবিদ্যা আপন হাতে তুলে নিয়েছিলেন।

গত যুদ্ধ যখন আমাদের আশ্বিনের আকাশে এলো, তারপর তার বীভৎসতায় জীবনানন্দ জীবনকে কুৎসিত ও কুরূপ ভাববার অবকাশ প্রচুর পরিমাণে পেয়েছেন। কিন্তু 'সংবর্তে'র সম্ভাবনা লক্ষ্য করে কালান্তর-বোধে সুধীন্দ্রনাথের লেখনী 'নান্দীমুখ' লিখে চলেছে এই ভঙ্গীতে :

> "তোমার যোগ্য গান বিরচিব বলে
> বসেছি বিজনে, নব নীপবনে
> পুষ্পিত তৃণদলে।

শরতের সোনা গগনে গগনে ঝলকে
ফুকারে পবন, কাশের লহরী ছলকে
শ্যাম সন্ধ্যার পল্লবঘন অলকে
চন্দ্রকলার চন্দনটীকা জ্বলে।
মুগ্ধ নয়ান পেতে আছি কান
গান বিরচির বলে।"

তখনকার স্নায়বিক যুদ্ধ ভোগ করবার যাঁদের বয়েস বা বিবেচনা ছিলনা তাঁরা 'সংবর্তে'র এই নান্দীমুখ থেকে কতোখানি কাব্যাস্বাদ লাভ করেছেন বা করতে পারবেন তা আমার জানা নেই। কিন্তু আমি সেই সেনারাজ্যে দাঁড়িয়ে এ-স্তব স্মরণ করে বলতে পারি যে তখন যুদ্ধের প্রতি উদ্দিষ্ট এই গাথার প্রতিছত্র মনে রোমাঞ্চ জাগাতে পারত :

"তবু অন্তরে থামেনা বৃষ্টিধারা
আর্দ্র, ধূসর, বিদেহ নগর
মৎসর প্রেত-পারা,
প্রকৃতির লীলা আবরি কুহেলীকানাতে,
ইঙ্গিতে যেন চায় অভিযোগ জানাতে ,
তন্ময় ধ্যান ভেঙে যায় তার হানাতে।
ছায়া-প্রচ্ছদে যাতায়াত করে কারা ?
কী নাম শুধাই উত্তর নাই
ঝরে শুধু বারিধারা ॥"

প্রকৃতির হিংস্রতার মতোই ইতিহাসের হিংস্রতা অধ্যায়ে অধ্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়—যুদ্ধ তেমনি ঐতিহাসিক হিংস্র দুর্যোগ। সুধীন্দ্রনাথ যুদ্ধের প্রাক্কালে স্থির করলেন : "স্বীয় শক্তিতে হবে যোগ দিতে

শুদ্ধিব তাণ্ডবে।" ভাঙবাব প্রস্তাব গ্রহণ কবলেন তিনি পৃথিবীব সভ্যতা যেদিন প্রলয়েব সম্মুখীন। এই ভাঙনেব মন্ত্র সেদিনকাব মানুষেব জাবনেব চাব দেয়ালেই ধ্বনিত হচ্ছিল। ব্যক্তি, সমাজ, জাতি আব পৃথিবী সেই চাবটি দেযাল। মানুযেব জীবনেব পবিধি বেড়ে গিয়েছিল তখন।

বামপন্থী কাব্য-চর্য্যাব কাল ১৩৩৮ সন, যখন সুধীন্দ্রনাথ এ-কবিতাটি বচনা কবেন। তাঁব মনেব সহধর্ম্মী হযেও এমন সুব-গীতিময় ছন্দধ্বনি অনেকেই তুলতে পাবেননি সেদিন। আমবা যে কালে পয়াবেব আলস্যে বেশি কাকণ্য আনতে চেযেছি কিম্বা ছন্দ-ঝঙ্কাবে 'বণিকেব জতুগৃহ' পুড়ে যাবাব স্বপ্ন বিতবণ কবছি, তিনি সে-কালে মাত্রিকছন্দেব পদমাত্রায় প্রীতিময় তন্ত্রীলযবৎ সুন্দব ধ্বনি দিতে চেয়েছেন প্রলয়েব মুখোমুখি দাঁড়িযে। তাছাডা এ-বণগাথাব বাক্যবিন্যাসেও তদানীন্তন দুর্ব্বোধ্যতাব চাতুবী নেই, কুযাশা নেই। সেদিন, সুতবাং, এ কবিতাব উৎকষ ছিল অপবিসীম। যতোই স গ্রাম মাকা কবিতা বচিত হোক, কাব্যবিচাবে প্রগতি এ-ধবনেব বচনাতেই নির্ণেয।

এখন থেকে ছত্রিশ বছব আগে সুধীন্দ্রনাথ যখন তবণ বযেসে লিখতে শুক কবেন তখনকাব একটি বচনা 'লগ্নহাবা'ব বাক্যাবলী দেখে মনে হয যে তিনি ম্যাথুইআর্ণল্ডে (To Marguerite) আসক্ত ছিলেন। আর্ণল্ড কবিতা বলতে 'জীবন সমালোচনা' বুঝতেন। সুধীন্দ্রনাথ কবিতা বলতে 'জীবন-সমালোচনা'ব বাইবে চলে গেছেন তা নয। অবশ্য 'জীবন' বলতে বা তাব ইংবেজী শব্দ life বলতে এমন একটি জটিল পটভূমি আমাদেব মনেব উপব উঠে আসে, এতো সুবৃহৎ তাব ব্যাস ও অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ যে জীবনেব প্রকৃত সমালোচনা নিজেব মনোদর্পণে সুস্পষ্টভাবে ফলিত কবে তোলা সম্ভবত অসম্ভব ব্যাপাব। সুধীন্দ্রনাথ তবু স্বাবলম্বী হয়ে জগৎ-সংসাবেব চিত্র আমাদেব চোখেব উপব খানিকটা তুলে

ধরেছেন। তা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞার ছবি। যোগ্য শক্তির পরাক্রম, বিনয় ও সদিচ্ছাপূত একটি জগৎ আমরা সে-অভিজ্ঞা থেকে মনের উপর তুলে আনতে পারি ১৯৫৩-পর্য্যন্ত তাঁর কাব্য-বস্তু অনুসন্ধান করে। নিরীশ্বর সেই সাংখ্যের জগতের ঈশ্বর তিনি স্বয়ং, পুরুষ। সুতরাং 'অর্কেস্ট্রা'র দিনের বোধ বা নারী-প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতি শেষ পর্য্যন্তও ক্ষুণ্ণ হয়নি। 'যযাতি' কবিতায় তিনি তাঁর প্রৌঢ় মনের চিত্র দেখাতে তৎপর হয়েছেন। মৃত্যুবাহিনী কাম-কলা হিংসাত্মক বেশে রাষ্ট্রে, সমাজে, মানবিক মনে বিসর্পিত। তার দর্পণস্থ রূপ দেখাতে গিয়ে তিনি বলছেন :

"অর্থাৎ কৃতান্ত আজ
[illegible] সর্ব ঘটে ; এবং প্রৌঢ়ের কেন সকলেরই
কর্তব্য যেমন অরণ্যে রোদন, তেমনি সম্প্রতি
সাধ্য লোকালয়ে সে-বৃথা বিলাপ ॥"

প্রৌঢ়তা এখানে বড়ো চিত্র নয়—মৃত্যুকে অকুতোভয়ে অবিলাপে স্বীকার করে নেওয়ার ভঙ্গী ও নমনীয় মনের ছবিটি চমৎকার। তাছাড়া অনবদ্য পয়ার-ভঙ্গীতে 'পিওর প্রোজ' (নির্জ্জলা গদ্য-ভঙ্গীর বাক্য) ব্যবহার। বাংলা ছন্দোবদ্ধ কবিতায় এ ধরনের গদ্য-বাক্য ব্যবহারের রীতি ও কৌশল সুধীন্দ্রনাথের যেমন ধ্বনি-শাস্ত্রানুগভাবে জানা আছে, তেমন আর কারো জানা আছে বলে আমি অন্তত জানিনে। শব্দ-ধ্বনি কোথায় কিরূপে পযুক্ত হলে কাব্যরীতি লঙ্ঘিত হয়না এ-জ্ঞান সুধীন্দ্রনাথ যদি মালার্মে থেকেও এনে থাকেন, তবু বলবো বাংলা কবিতার ধ্বনির উন্নয়নকল্পেই তিনি বৈদেশিক ধ্বনিজ্ঞ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন।

১৯৩৮ সনে সুধীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে 'পরিচয়' পত্রিকার শেষ-পর্য্যায় চলছিল। বুদ্ধদেব বসু তখন 'কবিতা' পত্রিকার যোগ্য পরিচালনার

ফলে জীবনানন্দ দাশকে কল্লোল-যুগের শ্রেষ্ঠ ফসলদাতৃ হিসেবে পরিচিত করতে সমর্থ হয়েছেন। বিষ্ণু দে-ও 'পরিচয়'-যুগের অর্দ্ধপরিচিতির সার্থক মোচন করতে সচেষ্ট হচ্ছেন তখন 'কবিতা'য় এবং সমর সেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীগত নৈরাশ্যের অনুভব নিখুঁত গদ্যে সময়ানুগ রসে পরিবেষণ করছিলেন 'কবিতা'-পাঠকদের। সে-সময়েই পূর্ব্বাশা'য় প্রথম কৈশোরক কবিতা লিখেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সমর সেনও কয়েক বছর আগে তাঁর প্রথম কবিতা 'পূর্ব্বাশা'তেই প্রকাশিত করেন। তরুণ কবিদের মধ্যে তখন সর্ব্বাধিক উল্লেখ্য ছিলেন দিনেশ দাস, অরুণ মিত্র প্রভৃতি। দিনেশ দাসের 'কাস্তে' সুধীন্দ্রনাথের মনে অনুরণন তুলে বলতে চেয়েছিল যে তার চেহারা 'বিকল প্রেমিকে'র। 'ক্রন্দসী'-গ্রন্থান্তর্গত কিছু কিছু কবিতা সুধীন্দ্রনাথ পূর্ব্বাশায় প্রকাশ করেন।

তখন বাংলা কবিতা শ্রেণীগত মনন ও মন ব্যক্ত করতে চাইত বামপন্থার হাওয়া সেবন করে। বলা বাহুল্য যে শ্রেণীগত কোনো পন্থা কবিতা-বিচারে সুধীন্দ্রনাথের মনে গণ্য হয়নি। গণ্য হয়েছিল 'পরিচয়'-পত্রের ধীমান শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য-বিচারে। তিনি তখন সমর সেনের কবিতার একটি আলোচনা প্রকাশ করেন। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার রসও তিনি শ্রেণী-প্রতিনিধিত্বের পাত্রে গ্রহণ করে পান করেছিলেন। জীবনানন্দে তিনি শ্রেণীর মনোভঙ্গী খুঁজে পাননি। তখনকার তাঁর একটি পত্রে (লেখকের নিকট লিখিত) জীবনানন্দের সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য বিধৃত ছিল:

> "জীবনানন্দ দাশকে বুদ্ধদেব আজকালকার শ্রেষ্ঠ কবি বলে। আমিও তাঁর লেখা মন দিয়ে পড়ি। গোটা কয়েক কবিতা খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু এখনও তাঁর মূল ছুঁতে পারিনি। যেদিন পারব সেই দিনই লিখ্‌ব, কাউকে বলতে হবেনা। একদিন এই গ্রীষ্মের ছুটিতে

তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়। তিনি মুখে যা কবিতা-সম্বন্ধে বল্লেন তা আমি গ্রহণ করতে পারিনি। এখনই যদি লিখতে বসতাম তবে মতামতের পার্থক্য আমার উপভোগের অন্তরায় ঘটিয়ে তাঁর কবিতার প্রতি অবিচার করাতে আমাকে প্রণোদিত করত। তাই তাঁর মতামত ভুলতে সময় নিচ্ছি।"

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ তখন বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সজনীকান্ত দাসের 'লম্বা রিভিউ' করেছিলেন বলেই লেখক তাঁকে জীবনানন্দের কবিতায় আলোকপাত করতে অনুরোধ জানিয়েছিল। কবির 'মূল' বলতে ধূর্জ্জটিপ্রসাদ শ্রেণীগত সমাজ-চেতনা বুঝতেন। অবশ্য সে-মূল জীবনানন্দ সমূলে উৎপাটন করেই কবি-ব্রতে নিজেকে দীক্ষিত করেছিলেন। প্রকৃত কবিতা রচনা বা সৃষ্টি করতে যাঁরা অগ্রসর হন, কাব্য-চেতনাই তাঁদের মনে দিনগতপাপক্ষয়কর যন্ত্র হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকে। ধূর্জ্জটিপ্রসাদ সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর ক্ষয়িষ্ণু মনোভঙ্গীর রূপ দেখতে পেয়ে হয়ত প্রীতি-আস্বাদন করেছিলেন কিন্তু এ-ক্ষয় তো সর্ব্বমানবিক তখন। সমাজতান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক নির্ব্বিশেষে সব দেশেই তখন ক্ষয়ের আবেগ। গত মহাযুদ্ধের পটভূমিকা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে যেম্নি উরোপায় তেম্নি এশিয়ায় একটা গোধূলি-বর্ণ দেখা যায়। আমাদের দেশের উপরও গোধূলির বক্তমেঘ অনুভূত হচ্ছিল। অরুণ মিত্র দেশের 'সীমান্ত এমনই অনিশ্চিত' দেখতে পেয়েছিলেন, যার ফলে প্রাক্তন শক-রাজ্যের অধিবাসীদের প্রতি তিনি আবেগ অনুভব করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে লেখক বলতে পারে যে শোক-বিলাসী বলে আখ্যাত হলেও লেখক তখন বাঙালী জাতির প্রাক্তন প্রতিষ্ঠান 'পামীর' বা 'বাম-ই-তুনিয়া'র পাখা মেলার স্বপ্ন দেখছিল। জীবনানন্দ তখন 'ক্লান্ত নাবিক', বনলতা সেনের নায়ক। সুধীন্দ্রনাথ যেন তখনই

সব চাইতে বেশি প্রস্তুত, সেই সময়টির 'যোগ্য গান' রচনার জন্যে। সেই সুরকেই তিনি সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ 'সংবতে'র ব্রত-কর্ম্মে প্রথম কবিতার স্থান দান করেছেন। যুগের জীবনতত্ত্ব তাঁর চাইতে বেশি কেউ কাব্যে পরিবেষণ করেননি।

'বামপন্থা' কবিতার বিষয় হতে পারে কি না এ-প্রশ্ন যেমন কেউ-কেউ সে-সময়টাতে আত্যন্তিক জ্ঞান-বিচারে বিবেচনা করেছেন, তেমনই স্বপ্নভ্রষ্টতায়ও কেউ কেউ তখন আহত হয়েছেন। কিন্তু আমরা মনে করি, কবি উত্থানপাদ পুরুষ। কোনো অবস্থাই তাঁকে পতিত রেখে চিন্তাবসাদে আবদ্ধ রাখতে পারেনা। তাঁর মুক্তি তাঁর নিজের কৃতিত্ব। এ-কৃতিত্ব বুদ্ধদেব বসুতে যেমন গোড়াতেই অঙ্কুরিত ছিল, তেমনই উপ্ত হয়েছিল সুধীন্দ্রনাথে তাঁর 'অর্কেস্ট্রা'র আমলে।

সুধীন্দ্রনাথের দ্বান্দ্বিক মনের প্রতিমা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে 'উত্তরফাল্গুনী'র 'দ্বন্দ্ব' কবিতায়। দেহ ও মনেব চিরন্তন দ্বান্দ্বিকতা এড়িয়ে এবং দ্বান্দ্বিক জড়বাদের চাইতে বৌদ্ধ দর্শনেব দ্বান্দ্বিক পরিণতিতে প্রস্থান করে তিনি বরং আরাম পান। এ-ক্ষেত্রে উপায়-অনুসন্ধিৎসু এলিঅট তাঁর 'ওয়েষ্টল্যাণ্ডে' একটি চাবির আওয়াজ শুনেছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কয়েদখানায় বসে, শুনেছিলেন 'দয়ধ্বম' আওয়াজের সঙ্গে :

> *Dayadhvam :* I have heard the key
> Turn in the door once and turned once only
> We think of the key, each in his prison....

বুদ্ধ যে 'আর্য্যসত্যে' বিশ্বাসী ছিলেন এলিঅট তাতে খ্রীষ্টানোচিত বিশ্বাসী হবার প্রয়াস দেখিয়েছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের পর। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের লগ্ন যেদিন এলো সেদিন এলিঅটের প্রজ্ঞা নিয়ে সুধীন্দ্রনাথ সদয় আর্য্যসত্যে বিশ্বাসী হতে চেয়েছেন বিপরীতভাবে 'দেহের দয়া'য়—বৈদেহী মারজয়িনী দয়ায় নয়। তিনি বুঝতে

পেরেছেন 'বিসংবাদ, বিকর্ষণ আর্য্যসত্য জাগ্রত জগতে'—সুতরাং বল্‌ছেন :

"আজিকে দেহের পালা ; রিক্ত শেজে শুয়ে তাই ভাবি
হয়তো বা তারই কাছে পড়ে আছে অমরার চাবি।"—দ্বন্দ্ব।

সম্যক দর্শন ও জ্ঞান অনুধাবন করে 'দেহবাদ'কে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে বিশ-শতক, সুধীন্দ্রনাথ সেই বিষজর্জ্জর বিশ-শতকের বাংলাদেশের নৈষ্ঠিক ও দুঃসাহসিক কবি। এ-দুঃসাহস তারুণ্যের আবেগে ক্ষণজীবী নয়, ক্রমোন্নত হয়ে সুদৃঢ়, চেতনায় চৈত্যের মতন স্থানকালব্যাপী, একটি শাশ্বত জীবনের জৈবতায় বা জন্ম-মৃত্যুতে অকাতর।

কল্লোল-শাখা

কল্লোল-যুগের দিকে যথার্থ দৃষ্টি নিয়ে তাকালে তাকে সমৃদ্ধ শাখায়িত অবস্থায় পাওয়া যায়। মূল কাণ্ডের শ্রেষ্ঠ ফলফুল যে ব্যক্তির কাব্য-সাধনার অন্তর্গত হয়ে পরবর্ত্তী যুগে বহু কাব্যপ্রবণ প্রাণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তিনি জীবনানন্দের চাইতে বেশি আর কেউ ছিলেন না।

মূল কাণ্ডের দু'টি শাখা 'প্রগতি' আর 'কালিকলম'। 'প্রগতি'র দু'জন সম্পাদকই কবিতায় আসক্ত ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অজিত দত্তের চাইতে বুদ্ধদেব বসুই কবিতা-আন্দোলনে বেশি অগ্রসর হয়ে গেছেন। 'কালিকলমে'র দ্বৈত সম্পাদকতার দফতর থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'লেখনী'ই 'অগ্নি-আখরে' নাম লিখতে এগিয়ে এলো নজরুলের 'অগ্নিবীণা'র আসরে।

দু'টি শাখা থেকে দু'জন কবি আমাদের জন্যে যে কাব্য-ফল চয়ন করে এনেছিলেন তার স্বাদ আলাদা; কারণ কল্লোল ঔপনিষদীয় কিম্বা বাস্তব তরু নয়। কল্পতরু। সমসাময়িক স্বপ্ন আর কল্পনা তার কাণ্ডে নূতন কাব্য-ফল আস্বাদের অভিপ্রায়ে শাখাঙ্কুর উদ্‌গমে সাহায্য করেছিল। যেমন জীবনানন্দের কাব্য-চরিত্র তেমনই প্রেমেন্দ্র মিত্রের ও বুদ্ধদেব বসুর কাব্য-ভঙ্গী অনুধাবন করে আমরা সে-সময়কার কাব্যগঠন মোটামুটি অনুভব করতে পারি।

স্বপ্ন আর কল্পনা পৃথক ব্যাপার হলেও তারা এক ঘরেরই বাসিন্দে। স্বপ্নের পরিস্রুত বা বিশুদ্ধ রূপকেই কল্পনা বলা যায়। কল্পনায় যুক্তি-বিচার সক্রিয় থাকে, স্বপ্নের অবস্থা সত্য হলেও অযৌক্তিক হতে পারে। অযৌক্তিক ব্যাপার সত্য বলেই গ্রাহ্য হয়।

স্বপ্ন যেমন সর্ব্বজনের অভিজ্ঞতায় আছে তেমনই অযৌক্তিকতাও সর্ব্বমানবিক হয়ে সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্য বা শিল্পকলা অযৌক্তিক স্বপ্নের পথে বিচরণ করবার সৎসাহস লাভ করে অযৌক্তিক স্বপ্ন লৌকিক সত্য বলেই। স্বপ্নদর্শী জীবনানন্দ সম্প্রতি তাঁব স্বপ্নের জন্যে যেমন সমাদৃত তেমন হয়ত তাঁর কল্পনাব রূপেব জন্যেও আদৃত নন।

কল্পনা কবিতার ক্ষেত্রে এসে বাস্তবকে স্বপ্নশীল করে তোলে। জীবনানন্দ এম্নি কল্পনায় বাস্তবেব নাটোরের বনলতা সেনকে স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে উপস্থিত করেছেন কিম্বা মৃণালিনী ঘোষালের 'শব'-কে রূপকথার নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য সূক্ষ্ম-বিচারে এসব রূপকথার বা স্বপ্নের অবয়ব বাস্তব জ্ঞানরাজ্যেব এলাকা সন্ধান করেই আনা যাবে। ইংরেজ কবি অ্যাণ্ড্রু ল্যাঙের 'ওডিসি' কবিতায় এ ধবনেব স্বপ্নবৎ বাস্তবেব মিশ্রণ ঘটেছিল। কীট্‌স্ তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'লা বেল ডেম সেন্‌স মার্‌সি' কবিতায় বাস্তবকে স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন একটু ঐতিহাসিক বুদ্ধি খাটিয়ে। স্বপ্নাবস্থায় কবি থাকেন না, স্বপ্নাবস্থাটাকে ব্যবহার করেন শুধু। 'ধূধূ এক প্রান্তর' কথাটি বলে সেখানে আমি প্রেতেব আবির্ভাব ঘটালেও কোনো বাঙালীর সংস্কার তাতে আপত্তি জানাবে না। তেম্নি অ্যাণ্ড্রু ল্যাঙ জানতেন

As one that for a weary space has lain

পংক্তিটি বলার পব Lulled by the song of Circe বল্‌লে তার অযৌক্তিকতা নিয়ে তর্ক উঠবে না ইংবেজ কাব্যাস্বাদীদের মনে, যদিও সার্সি তাঁদের ইংল্যাণ্ডের ত্রিসীমানায় 'ওডিসি'ব যুগেও মানায় না। ঠিক তেম্নি জীবনানন্দ 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে' কথাটির হাজার বছরী হাঁটার অযৌক্তিকতা আমাদের নিকট উপস্থিত করেছেন যেহেতু তিনি জানতেন জন্মান্তরে আমরা বিশ্বাসী। আর যাঁরা ঐতিহাসিক তাঁদের নিকট এই

চবণভঙ্গী অবলীলায় হাজার-বছর আগেকার বাংলা চর্য্যাপদের আচার্য্যদেব বিচরণ-চিত্র যে এনে দিতে পারে, তা-ও নিশ্চয়ই এই জ্ঞানী কবি জানতেন। মোটের উপর ব্যাপাবটা স্বপ্নে হাঁটা নয়। এরই নাম ন্যায়শাস্ত্রের 'জাষ্টিস্'। অযৌক্তিকতার সমর্থন।

এ-ধবনের স্বপ্নাত্মক কাব্যে, বলা বাহুল্য, কল্লোলের শাখায়িত কাব্য হুবহু সংবর্দ্ধিত হয়নি। World losers and world forsakers হয়ে অ্যাশু ল্যাঙেব মতো 'Pale moon gleams'-এ পাণ্ডুর দেখাতে চায়নি সেই কাব্য-শাখায় উদ্গত শক্তি। প্রেমেন্দ্র মিত্র মৃত্তিকায় যৌবনবন্দী উদ্দাম কবি এবং বুদ্ধদেব বসু যৌবনবন্দী হলেও অলৌকিক আলোতে ঈষৎ-মুগ্ধ কবি। 'জোগুণে ভরপুর প্রেমেন্দ্র মিত্রেব ছিল 'বাতেব রাজা' হবার ঔপন্যাসিক কল্পনা আব বুদ্ধদেবের সাধ সাদাসিধে ননীর তনু নায়িকাকে 'কঙ্কাবতী' নামে উপাখ্যানের কঙ্কালী মেয়ে করে তোলা। তার মানে, স্বপ্ন-ভঙ্গী ম্লান প্রবাহে হলেও খানিকটা করে শাখাতেও রূপায়িত করেছিল কল্লোল-যুগের কল্পতরু।

এঁদের পার্থক্য আমাদেব বিচারে এ-বকম: জীবনানন্দ কবি-সত্তায় প্রেমিক, বুদ্ধদেব প্রেমিক সত্তায় কবি আব প্রেমেন্দ্র মিত্র বিদ্রোহী সত্তায় কবি ও প্রেমিক। প্রেমেন্দ্র মিত্রেব মনোভঙ্গী সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেকটা তুলনীয়। বুদ্ধদেবেব দ্রোহ কদর্য্যতা ও স্থূলতার বিরুদ্ধে এবং এ-মনোভঙ্গীতে তিনি জীবানানন্দেব অনুষঙ্গী। প্রেমেন্দ্র মিত্র বা সুধীন্দ্রনাথ স্থূলতাবিবোধী নন। জীবনানন্দ ক্ষয়িষ্ণু সমাজের স্থূলতার বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়ে শেষ পর্য্যন্ত প্রেমের রাজ্য থেকেই যেন নিজেকে নির্ব্বাসিত করে ফেলে-ছিলেন। তাঁর মনোনীতা নায়িকা বা নেত্রী 'নারী' কল্পলোকবাসিনী বা অতীতের ইতিহাসে সঞ্চারিণী। কিন্তু বুদ্ধদেব নারীকে 'কঙ্কাবতী'র সুরে বেঁধে রেখে তাঁর প্রেমিক চিত্তের প্রেম ও অপ্রেম অবাধে নিবেদন করেছেন। তাঁর প্রেমের দর্পণধারিণী সে-কন্যা। ইংরেজ

'প্রি-রাফাএলিট' কবিবৃন্দের মতো প্রেমিকাকে নিয়ে যেন স্বর্গে-মর্ত্যে বিচরণ করতে তিনি উৎসুক ছিলেন।

এ-ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর মনোভাব উইলিয়ম মোরিসের মনোভঙ্গীর সঙ্গে সমধিক সমতাপ্রাপ্ত। মোরিস বলেছিলেন:

Love is enough, though the world be a-waning.

বুদ্ধদেব তাঁর 'বন্দীর বন্দনা'র অধ্যায়ে বলছেন:

"অমতের অন্বেষণে ভালোবাসি, শুধু ভালোবাসি
ভালোবাসি—আর কিছু নয়।"

কিন্তু প্রি-রাফাএলিটের প্রাণময় ভালোবাসা বুদ্ধদেব অনুকরণ করেননি। 'অমতের অন্বেষণ' অমরা পর্যন্ত তিনি করতে রাজি নন। মোরিস হারানো প্রিয়ার অন্বেষণে অমর অপ্সরলোকেও যেতে রাজি ছিলেন:

To seek the unforgotten face
Once seen, once kissed, once reft....

এই ছিল মোরিসের কামনা কিন্তু এমন প্রেমকামতা বুদ্ধদেবে নেই। এই কামতার পেছনে যে অবিনশ্বরতার স্পৃহা জাগ্রত তা ইয়েট্‌স ও জীবনানন্দে সুলভ। ভঙ্গুর প্রেমের দৃশ্যেও ইয়েট্‌স বলছেন:

"....From this night
Not a whisper, not a thought
Not a kiss nor look be lost"

নারীর স্থূলতা সম্পর্কে বিতৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও জীবনানন্দ 'মৃণালিনী ঘোষালে'র 'শব'কে স্বপ্নাতুর বাস্তবতায় মুড়ে এম্নি চিরন্তন করে গেছেন:

"... ম্লান নীল জ্যোৎস্নার আলো
এইখানে; এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব
ভাসিতেছে চিরদিন: নীল লাল রুপালি নীরব।"

মৃতের প্রেমিক-সত্তা কিভাবে ফিরে আসে তার চিত্র লরেন্স যেমন তাঁর 'দি শিপ অব ডেথ'-এ দিয়েছেন অনেকটা তেমন ভাবে ভাবিত হয়েই বুদ্ধদেব উত্তরকালে তাঁর 'কোনো মৃতার প্রতি' কবিতাটি রচনা করেছেন। বিস্মৃতি মথিত করে তার আত্মা আসে, লরেন্স বলেছিলেন। এই তাঁর বলার নমুনা ঃ

"....the frail soul steps out, into the house again
Filling the heart with peace.
Swings the heart renewed with peace
even of oblivion."

আত্মার উপর বিশ্বাস বা অবিশ্বাস এখানে বড়ো কথা নয়। কবির দৃষ্টিতে আত্মা মানে সত্তা। 'Custom of Soul' হৃদয়ের ইচ্ছারজ্জুতে যে কেমন আবদ্ধ থাকে প্রেমিক চিত্তে, তা এজ্রা পাউণ্ড তাঁর ৩৬-সংখ্যক ক্যাণ্টোতে বিশদভাবে জ্ঞানসন্ধিৎসুদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। তেমন কবিত্বময় সত্তার নিয়ম প্রেমিকমাত্রেই বহন করেন। প্রেমিক-কবি বুদ্ধদেব তো বহন করেনই। তিনি প্রেমস্মৃতি কি রকম পাত্রে বহন করছেন তা তাঁর 'কোনো মৃতার প্রতি' কবিতাটি উদ্ধৃত করলে আমাদের বিচারের পক্ষে সুবিধে হবে।

কোনো মৃতার প্রতি

'ভুলিবোনা'—এত বড়ো স্পর্দ্ধিত শপথে
জীবন করে না ক্ষমা। তাই মিথ্যা অঙ্গীকার থাক।
তোমার চরম মুক্তি, হে ক্ষণিকা, অকল্পিত পথে
ব্যাপ্ত হোক। তোমার মুখশ্রী-মায়া মিলাক মিলাক
তৃণপত্রে, ঋতুরঙ্গে, জলেস্থলে, আকাশের নীলে।
শুধু এই কথাটুকু হৃদয়ের নিভৃত আলোতে
জ্বেলে রাখি এই রাত্রে—তুমি ছিলে তবু তুমি ছিলে

এই মৃতা যদি ত্বগস্থিমাংসময়ী এ-যুগের 'কঙ্কাবতী'-ও হয়, তাহলেও কবি তাকে তাঁর স্বকীয় অমৃতলোকে চিরন্তনী করে রাখছেন না। সে যেমন ছিল 'ক্ষণিক' তেমনই শুধু 'এই রাত্রে' কবি তাঁর অস্তিত্বের অস্থি এনে হৃৎপাত্রে রেখে দীপারতি করছেন। স্মৃতিমন্থন আছে, বিস্মৃতির বুকে শান্ত দোলাও আছে, মৃতা সত্তার আবির্ভাবও ঘটছে ; কিন্তু লবেন্স যে অধিবাস-ভঙ্গী দিয়েছেন তার, তেমন ইঙ্গিত এ-কাব্যখণ্ডে নেই। বরং বলব, এ-কাব্যের রচনাকার সত্তাকে প্রকৃতির সত্তায় মুক্তি দিয়ে লবেন্সের উল্টো পথেই যেতে চাইছেন। এ-সমাধি যেন আর্য্য বৈদিক পদ্ধতির। এ-সমাধিতে বুদ্ধদেবের চরিত্রোচিত ও তাঁরই কাব্যগত রূপ যদি আমরা আবিষ্কার করতে পারি তাহলে দেখা যাবে, প্রকৃতি-পরায়ণ বুদ্ধদেব এই আপাত-ভঙ্গুর স্মরণকে অবিস্মরণীয় করে তোলারও আয়োজন করেছেন। মৃতার 'মুখশ্রী-মায়া'কে তিনি তাঁর চিরকাম্য বস্তু প্রাকৃতিক সত্তায় অর্পণ করছেন, প্রেম ও কবিতার চিরন্তন তর্পণ সমাধা করছেন। এই রাত্রি দেখানো সমাধির অর্চ্চনা তার কাছে তুচ্ছ।

এই সপ্তপদী কাব্যে সপ্তপদা হাটার যে নিবিড় সখ্যরস বিতরিত তা 'হাজার বছর হাঁটা'র ফল স্বপ্নিলা 'বনলতা সেন' দান করেনা। নাবিক উল্লসিসের মনে সাসি যে মোহমায়া-জাল বিস্তার করেছিল কিম্বা মহানাবিক শ্রীকৃষ্ণের মনে রাধা যে পরকায়া রসদাপ্তি এনেছিল, বনলতা সেন সেই ইন্দ্রজালের আলোছায়াগত প্রেমরসটুকু শুধু উপঢৌকন পাঠায় আমাদের মনের দ্বারে, তার চাইতে গভীরতর বিষয়ে মনোনিবেশ করায় না সাধারণত। জীবনের সঙ্গে এই ধরনের প্রেমের মিল কোথায় সে-জিজ্ঞাসা সাধারণত 'বনলতা সেনে'র পাঠকচিত্তে জাগ্রত হয়না। সেখানকার 'দু'দণ্ড শান্তি' দার্শনিক দৃষ্টিতে প্রস্থিত বলে কেউ বিচার করেন না। অবশ্য আমরা সে-বিচার উপস্থিত করেই বলছি যে পরকীয়া এবং স্বকীয়া

যে বিন্দুতে মিলে যায় সেই ক্ষণিকের স্থিরবিন্দু নিয়েই 'বনলতা সেন' এবং 'কোনো মৃতার প্রতি' কবিতা দু'টি রচিত। কিন্তু বুদ্ধদেব ঢের বেশি শান্তির আয়োজন করেছেন এই সখ্যভাবগত বিন্দু-বর্ণনায়। শান্তরস যে সংযত প্রেম থেকে প্রবাহিত হতে পারে, 'বন্দীর বন্দনা'র কালেও বুদ্ধদেব সেই সংযত প্রেমের উপাসক বা প্রেমিক ছিলেন। বহুবল্লভা নারীর প্রতি আক্রোশ ছিল তাঁর যৌবনে কিন্তু সে আক্রোশও কালের কঠোর স্রোতে ক্ষয়িত হয়ে গেছে 'কোনো মৃতার প্রতি' রচনার সময়ে। মৃতা যদি বহুবল্লভা দ্রৌপদীও হয়ে থাকেন, তবু এ-সময়ে কবি দেখতে পাচ্ছেন যে দ্রৌপদীর শাড়ি 'অন্তহীন'—সে-শাড়ি কৃষ্ণাপ্রেমদ্রোহে এক-এক করে খুলে ফেলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই বাস্তব জ্ঞানে জ্ঞানী, স্থানকালপরায়ণ বুদ্ধদেব স্থৈর্যে ও সংযমে যে পরিশেষে শান্তরসের এমন একটি অনবদ্য নৈবেদ্য সাজাবেন তাতে বিস্মিত হবার কোনো কারণ নেই। আমরা বরং বিস্ময়বোধে অদ্ভুতরস পেতে শুরু করি জীবনানন্দের আশ্চর্য চর্যা পাঠ করে। স্থানকালপাত্রকে তিনি লোষ্ট্রবৎ ছুঁড়ে ছুঁড়ে চলেছেন। বিজ্ঞ দার্শনিকের ভঙ্গীতে তিনি বলতে জানেন: আমি কিছুই জানিনে। এমন ছুঁড়ে দেওয়া প্রেমেন্দ্র মিত্রের পক্ষেও সম্ভবপর হয়নি, যিনি 'প্রথমা'র কালে মনে করতেন 'মাটির ঢেলা' পৃথিবী ছোঁড়াছুঁড়ির পালায় আবদ্ধ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাস্তব, বৈজ্ঞানিক ও রজোগুণান্বিত স্বভাব নটরাজ মূর্তিকে ধ্যান করেও প্রেমে বন্দী হতে জানত পুরাকালের রাজন্যদের মতো। মাটির ঘর তাঁর নিকট জীবনানন্দ-ভঙ্গীর উপেক্ষা পায়নি, এমন কি বুদ্ধদেব ভঙ্গীর বিতৃষ্ণাও লাভ করেনি।

বুদ্ধদেবের এই কবিতাটির মনোভঙ্গী তিন ভাগে তিন নক্সার। প্রথম দু'টি পংক্তিতে তিনি প্রাণবাদী বা বাস্তববাদী, বিস্মৃতিকে মানব-মনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলে ধরে নিচ্ছেন। তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম পংক্তিতে তিনি স্মৃতি-প্রতিষ্ঠা বা প্রেতকৃত্য করছেন। কার

মুক্তি তিনি চাইছেন, সে-প্রশ্নেই কাব্যান্তর্গত ব্যঙ্গ্যের সন্ধান মিলবে। স্বকীয়া মুক্তি কি পরকীয়া মুক্তি, তা-ই হবে কাব্য-বিচারের জিজ্ঞাস্য। এবং তা সুনির্দ্ধারিত করতে হলে ষষ্ঠ ও সপ্তম পদে এসে কবির হৃদ্‌গত সত্যরসের ধ্রুপদী পরিচয় নিতে হবে, যদি ইতোমধ্যে আমরা সে-সম্পর্কে অজ্ঞান থেকে যাই। এ-কবিতার বাচ্যাতিরিক্ত ভাবের আয়োজন নজরে না পড়লে কবিতাটি সহজ ও সাধারণ জ্ঞানে উপেক্ষিত হবে। কিন্তু যখন এর ব্যঞ্জনা-ক্ষমতা বা ব্যঙ্গ্য আমাদের অনুভবে ও উপলব্ধিতে আসতে সুরু করে তখন দেখতে পাব যে প্রত্যেকটি পংক্তির প্রত্যেকটি শব্দ সুনির্ব্বাচিত হয়েছে ব্যঙ্গ্যকে ধ্বনিত করবার অভিপ্রায়ে। জীবনানন্দও শব্দ-নির্ব্বাচনে তৎপর ছিলেন। তাঁর ভাষাকে অলঙ্কৃত বা অলঙ্কার-বর্জ্জিত করবার অভিপ্রায়েই প্রধানত সেই তৎপরতা নিয়োজিত হয়েছে। বাস্তবকে স্বপ্নাচ্ছন্ন করবার কৌশল বা স্বপ্নকে বাস্তবে নিয়ে আসবার ক্ষমতা তাঁর কতোটুক, তারই পরীক্ষা দিয়ে গেছেন তিনি বাংলাভাষা-ভাষাদের নিকট। বুদ্ধদেব বসু এ-পরীক্ষায় বসেননি। প্রেমেন্দ্র মিত্র বরং এ-পরীক্ষায় এসে বসেছেন সম্রাটোত্তর 'ফেরারী ফৌজ' নিয়ে জন্মনার কালে। স্বপ্ন-ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে জীবনানন্দের সহমর্ম্মী হয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র আর শব্দ-ব্যঞ্জনা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব ও সুধীন্দ্রনাথ একই রকমের প্রযত্নশীল। তবে সুধীন্দ্রনাথের শ্রুতিতে শব্দাবলীর প্রাচীনত্ব ও নবীনত্ব সম্পর্কে কোনো বাছবিচার নেই, মূল অর্থ ও ধ্বনিসৌকর্য্যে শব্দসম্পদ পাংক্তেয় হয় তার কবিতায়। স্বপ্ন-ব্যঞ্জনায়ও প্রাচীনত্ব ও নবীনত্বের বিচার বরদাস্ত করা চলেনা। কিন্তু বুদ্ধদেব শব্দ-সম্পদে প্রাচীনত্ব ও নবীনত্বের বিচার করতে ইচ্ছুক এবং তিনি নবীনতার পক্ষপাতী।

বুদ্ধদেব বসুর পরিণতি আকাবাঁকা রেখায় হয়নি, কারণ তিনি যাত্রা সুরু করেছিলেন সহজ সরল রেখায়। সহজাত অলৌকিক আলোর আভা তিনি সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ ও পালন করেছেন।

তাঁর বস্তুনিষ্ঠ মন 'দময়ন্তী'র যুগে একটু ভারি হয়ে উঠলেও 'দ্রৌপদীর শাড়ি'র অধ্যায়ে তা ভারসাম্যে স্থির হতে পেরেছে। বুদ্ধদেব বসু যে এ-যুগের স্বতন্ত্র মানসিকতায় উজ্জ্বল একটি বৃত্ত তা চিনে নিতে, আশা করি, কোনো কবিতা-পাঠকের মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকেনা।

কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রকে তাঁর পরিণতির 'মৃত এক মহাদেশ' থেকে আবিষ্কার করা কঠিন, যেহেতু গোড়ায় তিনি 'জীবন-মহাদেবে'র নৃত্য-ভঙ্গীতে মুগ্ধ ছিলেন। মধ্য অধ্যায়ের 'শিব নীলকণ্ঠ' পাংক্তেয় কবিতার রস বা বিষামৃত মনস্তত্ত্বের এলাকার বস্তু। মনস্তত্ত্ব অতিমাত্রায় স্বাতন্ত্র্যপর। সুতবাং জটিলতা এর পায়ের নূপুর। নূপুরধ্বনির স্থিরতা নেই। কখনো সহজ, কখনো জটিল, কখনো কঠোর এবং কখনো বা অস্পষ্ট। উপাখ্যান-উপন্যাস পাঠে ও ঘটনার ইতিহাসে আসক্ত হয়ে যে মনের যাত্রা সুরু হয় তার রচিত কাব্যে উপন্যাসগত মনস্তত্ত্ব অবাধ প্রবেশপথ লাভ করে। মেবিডিথ ও টমাস হার্ডির কবিতায় মনস্তত্ত্বের ছায়া ও দৃশ্যবিন্যাস উপন্যাস-সুলভ হয়েছে দেখা যায়। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার স্থান-কালপাত্রপাত্রী অনেক ক্ষেত্রে মেরিডিথের 'লভ্ ইন্ দি ভ্যালি' কবিতার ঘটপটাদি স্মরণ করায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কথা' কবিতার সুর টমাস হার্ডির প্রৌঢ়-প্রেমের মনোদৃশ্য বর্ণনার এ-কথাগুলো ধ্বনিত করে তোলে :

> "Or is it only the breeze, in its listnessness
> Travelling across the wet mead to me here"

প্রবীণ ঔপন্যাসিকের এই কাতরতা মনে পৌঁছুলেই মনে পড়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কথা'র শব্দাবলী :

> "বৃষ্টি হয়ে গেলে পর
> ভিজে ঠাণ্ডা বাতাসের মাটিমাখা গন্ধের মতন"

একই রকম মনোযন্ত্রের তন্ত্রীলয়। কিন্তু এ-যন্ত্র হাতে নিয়ে গীতিকার হতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মনে কোনো যন্ত্রণার বাধা উপস্থিত হয়না। অত্যন্ত সহজ স্রোতে তিনি কথার ধ্বনি বইয়ে দিয়ে যান। নিজের মনোযন্ত্রের সঙ্গে পরিচয় যাঁর সমাপ্ত, সেই শিল্পী আপনার মনশ্চিত্র ও মনশ্চরিত্র ব্যাখ্যায় কার্পণ্য করতে পারেন না। তাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় তাঁর মনশ্চিত্র ও মনশ্চরিত্র অকপটে প্রসারিত হয়েছে। এই মনকে যারা সহৃদয়তায় গ্রহণ করতে পারে, তাঁদের নিকট তিনি সমুদ্ভাসিত কবি। তাঁর হৃদিস্থিত 'নীল তারা' আর গৃহস্থ 'তিনটি জোনাকি' একই রকম আলো বিতরণ করবে সহৃদয়-মানসিকতায়। আকাশের তারায় যে তাঁর টেনিসন-সুলভ ভীতি আছে তা-ও কাব্য পাঠকরা দেখতে পাবে তাঁর সম্রাট-অধ্যায়ের মনোভঙ্গীর গীতি শুনে। বায়রণের "আমরা যাবনা নৌকাবিহারে" কবিতার অথবা টেনিসনের 'কম্ ডাউন ও মেড' কবিতার '*Cease to move so near the Heavens*' উপদেশ প্রেমেন্দ্র মিত্র 'ছাদে যেওনাকো' কবিতায় হুবহু মেনে চলেছেন কিন্তু জীবনানন্দ 'সুরঞ্জনা' কবিতায় এই উপদেশের বিপরীতগামী মনোভঙ্গী প্রকাশ করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র ভূমি ছাড়তে রাজি নন আর জীবনানন্দ 'নক্ষত্রের রুপালি আগুন' ছাড়তে গররাজি। যদিও তাঁরা উভয়েই 'স্বপ্ন' দেখতে চান, প্রেমেন্দ্র মিত্র মন্ময়ী পুতুল ও প্রতিমার চাইতে বেশি কামনা করেন না—জীবনানন্দের 'নারী' তাঁর স্বপ্নের দ্যুতিতে নেই। তবে 'ফেরারী ফৌজে'র অধ্যায়ে পৌঁছে সম্রাটধ্যায়ী কবি যে মৃত 'মহাদেশে' দেখছেন তাতে পুতুল ছাড়া প্রতিমা পাবেন কি না সন্দেহ। প্রতিমা খানিকটা আকাশচারিণী। মৃত্তিকাসক্তি প্রতিমার অবয়ব-গঠনে সমর্থ কিন্তু তাতে অলৌকিক প্রাণময়তা দান করতে হয়ত সমর্থ নয়। শেষ 'আবিষ্কার'-এ তিনি বলছেন ঃ

"মৃত সেই মহাদেশ
আব বার করি বিচরণ
একটি পুদ্গল বীজ করিতে বপন।"

মরা মাটিব ইচ্ছা-শক্তিব সীমা কতোটুকু তা আমাদের জানা নেই বলে এই বীজেব অলৌকিক ফলাফলও মনে অজ্ঞাত। মৃত মহাদেশের পুত্র কোন্ জনকের কোল আলো কববে তা-ও আমরা জানিনে। তবে কবি হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে রজোগুণী, আদর্শশীল ও আশাবাদী বলে স্বীকাব করব।

তৃতীয় ও চতুর্থ দশক

॥ এক ॥

কল্লোল-প্রগতির ও কালিকলমের সাহিত্যিক আন্দোলনের পর যুগ হিসেবে বাংলা সাহিত্যের বিচার করা মুস্কিল, দশক হিসেবে সাহিত্যের মতিগতি এবং চিত্রচরিত্র দেখাই প্রশস্ত। দশকগুলোও শতকের নমুনায় শেষ দিকে হিসেব-নিকাশ দেখায়। আমরা যদি তৃতীয় দশকটির দিকে তাকাই তাহলে সেখানে 'পরিচয়' (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত), 'বিচিত্রা' (উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত), 'পূর্ব্বাশা' (লেখকের সম্পাদিত), 'কবিতা' (বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত) এবং 'চতুরঙ্গ (বুদ্ধদেব বসু হুমায়ুন কবীর সম্পাদিত) নামক নূতন সাহিত্য-পত্রিকার প্রতিষ্ঠান দেখতে পাব। দশকের মানসিক ফসল এসব পত্রিকার মারফতই বেশি পরিবেশিত হয়েছে। কবিতা পরিবেষণে অগ্রসর ছিল 'পরিচয়-পূর্ব্বাশা-বিচিত্রা-কবিতা-চতুরঙ্গ'। অন্যান্য বহু ক্ষণজীবী সাহিত্য-পত্রিকাও কবিতা-পুষ্টির সহায়তা করেছে। উরোপা-আনা ষোল-আনা আস্‌তে চেয়েছে এ-সময়কার কবিতায়।

রবীন্দ্রনাথ কোনো জাতীয় কবিতাতেই বিশেষ আপত্তি জানান নি, আপত্তি ছিল তাঁর দুর্ব্বোধ্য কবিতায়। কবিতায় দুর্ব্বোধ্য অলঙ্কার প্রয়োগ বা দুর্ব্বোধ্য ভাষা ব্যবহার সব ক্ষেত্রে যে কবি-কৌশলে সম্পাদিত হত, তা নয়। নূতন রূপকল্পের উদ্ভাসের দরুণ তার মূর্ত্তিদানের ভাষায় অনেক ক্ষেত্রে দুর্ব্বোধ্যতার ইঙ্গিত দেখা দিত। এ-ব্যাপারটি ইতিহাস-চেতনার ফলে পাউণ্ড এবং এলিঅটে তো ছিলই, তাছাড়া ছিল ইংরেজ কবি ডান ও জেরার্ড হপকিন্সে। দুর্ব্বোধ্যতা মেটাফিজিক্যাল চিন্তা থেকেও আসে, যেমন 'চর্য্যাপদে'

দেখা যায়; তেম্নি ডান্ ও হপকিন্সে তা অনুভব করা যায়। তবে হপকিন্স ধ্বনির ব্যঞ্জনায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দুর্ব্বোধ্য হতেন, দ্বৈতার্থ বহন করবার ক্ষমতা তাঁর শব্দের বিন্যাসে থাকত; অন্ধ্র প্রাকৃত কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছের এই ক্ষমতা ছিল। দ্বৈত-বোধ আশ্রয় করে অদ্বৈত পূর্ণতার বোধে কবিতার অঙ্গ-প্রসাধন বিধেয় বলে অন্তত কাব্যসূরীবৃন্দ বলবেন। কিন্তু পদ্যকার ও সমালোচক স্টার্জ মূর হপকিন্সের জড়িমা দূর করবার অভিপ্রায়ে আপন স্থূলতার পরিচয় দান করলেন—আপন হস্তক্ষেপে তিনি হপকিন্সের যে সংশোধিত পরিণতি দেখালেন তাতে না রইল হপকিন্সের আবেগময় ভাষা, না রাগরাগিণীর উত্থানপতন।

পদান্তে অনুপ্রাসের ধ্বনি ছাড়া যে পংক্তির অন্তর্গত শব্দ-পরম্পরার বিন্যাস ধ্বনির একটি স্পন্দন জাগাতে পারে এ-জ্ঞান রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দের কবিতা ত্রিশেই আমাদের মনে এনে দিয়েছিল। হপকিন্সে মনোযোগী হলে তা আগেই হয়ত আসত। প্রেমেন্দ্র মিত্র 'প্রথমা'র যুগে গদ্যভাষায় কবিতা লেখেন কিন্তু ত্রিশের বৎসরগুলোতে রবীন্দ্রনাথ হপকিন্সের চেতনায় জাগ্রত হলেন। হপকিন্সের "সীসকের ও স্বর্ণের প্রতিধ্বনি" গ্রন্থের অন্তর্গত শব্দ-গরিমা শোনা গেল। গদ্যছন্দের কবিতায় সমর সেন এই ধ্বনির প্রতি খানিকটা মনোযোগী হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম কবিতা পূর্ব্বাশায় বেরয়, পরে তিনি 'কবিতা'-পত্রিকায় বিশিষ্টতা অর্জ্জন করেন। রূপকল্পেও তিনি বৈশিষ্ট্য দেখাতে সমর্থ হয়েছেন।

১৯৩৩-এ রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে যে গদ্য-কবিতার ভঙ্গী দেখান তা বাংলা কবিতার অন্তর্গত নানা দিকের বন্ধন-মোচন করেছিল। ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের মনে আমরা হিন্দু মাতৃমন্ত্রের ছায়া দেখতে পেলাম 'শিশুতীর্থ' কবিতায়। একটি নবজন্মকে স্বাগত জানাচ্ছেন তিনি, যখন বাংলার তরুণ শাক্তবৃন্দ বন্দীশিবিরে। হিটলারের রাজ্য-প্রাপ্তিও এই সনে। হিটলার-

সম্পর্কে অচেতন প্রাচ্য-ভারতে 'পূর্ব্বাশা'র জন্মও এই সনে বলে বামপন্থার হুজুগের দিনে 'পূর্ব্বাশা'র সাহিত্য-প্রচেষ্টাকে ফ্যাসিজম্-এর সহায়ক রূপে কুখ্যাত করবারও অপচেষ্টা হয়েছে। সে যা-ই হোক, সমর সেনের গদ্য-কবিতা প্রকাশ করা ছাড়াও পূর্ব্বাশা ১৯৩৪-এ প্রেমেন্দ্র মিত্রের, বুদ্ধদেব বসুর এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গদ্য-কবিতা (লরেন্সের অনুবাদ) প্রকাশিত করেন। ১৯৩৬-এ যখন 'কবিতা'-পত্রিকা বেরয় তখন গদ্য-কবিতার ছন্দ সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নানা ব্যক্তির। সমর সেন সেই ছন্দসূত্র সম্পর্কে তখনই সচেতন হন। কিন্তু এ-ছন্দের ধ্বনি-সূত্র বিচিত্রতায় উজ্জ্বলতর হয়েছিল অমিয় চক্রবর্ত্তীর কবিতায়। তিনি যেন শব্দময়ী পৃথিবীর পুরনো আর নূতন শব্দ জড়িয়ে তার যোগ্য ভাষা দেবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন।

এ-ছন্দে ঔৎসুক্য বহু ধ্বনি-সিদ্ধ কবির ছিলনা। ১৯৩৪-এ 'পরিচয়ে'র দ্বারা পরিচিত কবি বিষ্ণু দে 'পূর্ব্বাশা'য় যে পঞ্চমাত্রিক পূর্ণাঙ্গ-ধ্বনির ছন্দে 'পুনশ্চ' নামে কবিতাটি প্রকাশ করেন তার বক্তব্যও ভাষা প্রাচীন হলেও ছন্দ-কৃতিটি নূতন ছিল। রবীন্দ্রনাথ, মোটের উপর, এ-দশকে বাঙালী তরুণ কবিদের চিত্তে ধ্বনি-জ্ঞান বিতরণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আটপৌরে কথাবার্ত্তায়ও যে বাঙালীর ভাষা ছন্দের দোলা আনতে সমর্থ এ-তথ্য সবাই ইতঃপূর্ব্বে জান্‌তেন না, জানলেও কাব্য-নির্ম্মাণে তার ব্যবহার মানতেন না।

ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দের কবিতা বাংলা কবিতার রোমান্টিক ভাবটিকে ইতিহাসানুগ ও বাস্তব-স্বভাবাপন্ন করে মোড় ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল। তার প্রতিক্রিয়া নানা চিত্তে নানা আকারে চল্‌তে লাগল। আটপৌরে হতে গিয়ে পৌর মধ্যবিত্ত তরুণ দিনেশ দাস 'কাস্তে' নামক বিখ্যাত কবিতাটি রচনা করলেন যাতে পৌরাণিক, কৃষি-সভ্যতার ধার ঝিল্‌কিয়ে উঠ্‌ল। সমর সেন উর্ব্বশী-কামনায় পৌরুরবিক সুর শোনালেন। এবং

অবশেষে বিষ্ণু দে ঘোরতর অ-রোমান্টিক হয়ে উঠলেন। ফলে 'ঘোড়-সওয়ার'-এর একটি মূর্ত্তি আকতে গিয়ে তিনি ববীন্দ্রনাথেব অনুভবে দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠলেন। বাস্তবতার দৌড় লাগাম মানে না। ববীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন জাতীয়তাবাদে, ইতিহাসে, প্রেমস্বভাবে বাস্তবতা আবদ্ধ থাকবে, কিন্তু বিষ্ণু দে দেখালেন যে বাস্তবতাব আরো রাস্তা আছে।

কবি কর্ম্ম বস্তুত অন্তঃকরণের প্রকাশ। তৃতীয় দশকে নানা-জাতির অন্তঃকরণই প্রকাশিত হয়েছে বাংলা কবিতায়। দেশাত্ম-বোধের ও বামপন্থার ছাপ এসেছে কবিদের মনে কিন্তু যে-স্থলে ছাপগুলো অভিজ্ঞতাব স্পর্শ পায়নি, পুঁথিগত বা বিশ্ববার্ত্তাগত জ্ঞানের মারফত চেতনায় বা চিন্তায় এসে ভাবনার অবকাশ দিয়েছে, সে-স্থলে তার বর্ণনা কাব্য-ধর্ম্মে অভিষিক্ত হতে পাবেনি। মগজ সক্রিয় হওয়া আর অন্তঃকরণে ছাপ পড়া হয়ত এক কথা কিন্তু অভিজ্ঞতা এমনই একটি ব্যাপার যাতে মগজের কাজ ব্যতীতও অন্তঃকরণ ছাপ গ্রহণ করে। তাকে অনুভব বলা যায়। কোনো বিষয়ে অনুভব পেতে হলে তার ভেতরে বসবাস কবতে হয়। বামপন্থার অন্তর্গত হয়ে যেহেতু কবিদের ভেতর কেউ বাস করবার সুযোগ পাননি তারই জন্যে ভাবনাবিষয়ক উপাদানে ভালো কবিতাও তৈরী হয়নি। বরং দেশাত্মবোধে অনেক ভালো কবিতা তৈরী হয়েছে, কেননা এ-বোধ ছিল অভিজ্ঞতার ও অনুভবেব অন্তর্গত। এলিঅট উরোপার মঙ্গলকামনায় গতযুগের অবসানে যে 'জর্নি' চালিয়ে হিমালয়ে পৌছেছিলেন তাতে অভিজ্ঞতাব ব্যাপারটা অনুপস্থিত ছিল। তিনি ভেবে-চিন্তে অনুভবেরই প্রান্তে তাঁর জ্ঞানকে পৌছিয়ে দিতে চেয়েছেন যা খানিকটা জীবনানন্দে দেখা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৩-এ 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে 'শিশুতীর্থ' কবিতায় যে 'সিন্ধুতীরে' এসে দাঁড়িয়েছেন তাকে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার বাইরের দেশাত্মবোধ আমরা বলব না।

অনুভবের একটা ভিত্তিভূমি বাস্তব ক্ষেত্রে থাকা চাই। সে অনুভব রঞ্জিত হয়ে চলে বা জটিল আকার ধারণ করে ক্রমান্বয়ে জ্ঞানার্জ্জনের ও অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের দ্বারা। পরিপক্ক অনুভূতি কবিতার জন্ম দেয়। তৃতীয় দশকে যে সাম্যবাদের জ্ঞান এসেছিল তা এযাবৎকাল জ্ঞানের দ্বারাই রঞ্জিত বা জটিল হচ্ছে। অভিজ্ঞতার বা অনুভূতির ভিত্তি তা পায়নি; সুতরাং বামপন্থার কাব্যকৃতি অন্তঃকরণের যে ছবি দেখায় তাতে কাব্য-পাঠক মনে সাড়া পান কিনা সন্দেহ। কল্পনার দেখাকে স্বপ্নের দেখাতে তুলে না ধরতে পারলে কাব্য-কর্ম্মে ও কাব্য-ধর্ম্মে খুঁত থেকে যায়। স্বপ্ন সম্পূর্ণত অন্তঃকরণের তৈরী বস্তু। অন্তঃকরণের প্রক্রিয়াকে অতি প্রযত্নে আয়ত্ত, অনুভব এবং প্রকাশ করতে হয়। যিনি তা করতে পারেন তিনিই কবি। প্রকাশ করাতে প্রযত্ন থাকার অর্থ এই নয় যে তা বৈজ্ঞানিক সুবোধ্য বাক্যে আপন কৃতিত্ব প্রদর্শন করবে। ন্যায়শাস্ত্রের বিচার ভাষা ও ভাব অনেক ক্ষেত্রে মানতে অস্বীকারও করতে পারে। যেমন স্বপ্ন তা মানে না। সেই অবাধ্যতাকেও যত্নসহকারে কবিতায় স্থান দেওয়া যায়, যেমন হপকিন্স দিয়েছেন। এজ্রা পাউণ্ডও সে-চেষ্টায় সফল হয়েছেন। বাংলা-কবিতায় এ-ধরনের যে প্রয়াস হয়েছে তা 'কবিতা'-পত্রিকায় প্রকাশিত হবার সুযোগ লাভ করেছিল তৃতীয় দশকে।

অন্তঃকরণের প্রকাশে সমর সেন যে বিদ্রূপের আশ্রয় নিয়েছিলেন তার বীজ সুধীন্দ্রনাথে ছিল। জীবন সমালোচনায় বা সামাজিক আচরণের চিত্র প্রদর্শনে সে-যুগ কুরূপকে আবৃত করে সুরূপ প্রকাশে বিশেষ মনোযোগী না হয়ে স্বরূপের প্রতিই যে নিষ্ঠা দেখিয়েছে তা বলব না। সমর সেন মধ্যবিত্ত জীবনের নেতিবাচক দিকটিকে এতো বেশি উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন, যার দরুণ তিনি শেষ পর্য্যন্ত ক্লান্তিকর। কোন একটি অভিজ্ঞতা শুধু নেতিবাচক দিক নিয়ে মানুষের জীবনে উপস্থিত হয়না; তা যদি হত তাহলে সে-অভিজ্ঞতার

পরমায়ু মানব-সভ্যতা থেকে নাকচ হয়ে যেতো। মধ্যবিত্ত জীবনে শুধু না-পাওয়ার শূন্যতাই যদি থাকত তাহলে তা নিয়ে একটি শ্রেণী কি উপায়ে বেঁচে যাচ্ছে? না-পাওয়ার নৈরাশ্য থেকে শোকার্ত্ত পংক্তি রচিত হতে পারে এবং রোমান্টিক কবিরা এই শোক-ব্যঞ্জনায় কাব্যে মাধুর্য্য রসও দিতে পারেন। সমর সেনের কবিতা ক্রমে রুক্ষ হাহাকার দিয়েছে, বিদ্রূপ-বিষ ছড়িয়েছে, মাধুর্য্য দেয়নি। মাধুর্য্য আসে নৈরাশ্যজনিত শোকাচ্ছন্নতায় হঠাৎ একটু আশার বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হলে। তার জন্যেই কবিরা জীবনের স্বরূপ সন্ধান করেন এবং এ-সন্ধানে নৈরাশ্যের ভেতরও আশার আলো দেখা দেয়। অবশ্য সে-আশা সামাজিক চেহারা থেকে আসেনা, ব্যক্তি-জীবনের অঙ্গ থেকেই অথবা বাঁচবার সাধ থেকেই কবিকে জীবনের আশার দিকটি কুড়িয়ে নিতে হয়। বিষ্ণু দে নৈরাশ্য-চক্রে পরিভ্রমণ করেছেন, আশান্বিত সমাজ কল্পনা করেছেন এবং অবশেষে ইদানাং ব্যক্তি-জীবনের প্রতি আকর্ষিত হয়েছেন। সমর সেন অর্দ্ধপথে পরিক্রমা শেষ করে কাব্য থেকে অন্তর্হিত।

তৃতীয় দশকে কাব্য-সঙ্কলন গ্রন্থ একাধিক বেরিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একটি সঙ্কলন-গ্রন্থের সম্পাদকতা করেছিলেন এবং বিষ্ণু দে-র কবিতা বর্জ্জন করেছিলেন। তখনকার বুদ্ধিজীবী তরুণ-চিত্ত কিন্তু বিষ্ণু দে এবং সমর সেনের উপর আত্যন্তিক আশা পোষণ করেছিলেন। হয়ত এ-আশার পেছনে রবীন্দ্রনাথের বিচারের প্রতি একটি কটাক্ষ উদ্যত ছিল। কবিদের প্রতি কাব্যোৎসাহীর যুক্তিহীন আশা-আগ্রহ কবিকে কদাচিৎ সুপথ দেখায়। তেম্নি উপেক্ষা ও অনাদর কবি-প্রতিভার শিকড় শুকিয়ে ফেলে। রবীন্দ্রোত্তর কাব্য-সমালোচনা বাংলাদেশে তেমন কিছু হয়নি।

'প্রগতি'র সম্পাদক অজিত দত্ত একজন উপেক্ষিত কবি। যতীন সেনগুপ্ত, মোহিতলাল প্রভৃতি যেকালে (দ্বিতীয় দশকে) বাংলা-কবিতায় একটি উপেক্ষিত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনছিলেন,

সেকালেই অজিত দত্ত তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর এঁকেছিলেন বহু স্মরণীয় কবিতায়। যে-কবি এমন পংক্তি রচনা করেনঃ "মোর কাব্যে অনশ্বর হয়ে থাক এ জন্মের দেহ" তাঁর কাব্য-দেহে এলিজাবেথীয় উপেক্ষিত নাট্যকারদের ভঙ্গী আমরা অনায়াসেই আবিষ্কার করতে পারতাম কিম্বা পারতাম ভবভূতির কাব্যানুবাদ সন্ধান করতে। কিন্তু তা করা হয়নি। অন্নদাশঙ্কর রায় বিচিত্রা-পত্রিকা মারফত পরিচিত হয়ে বাংলা কবিতায় অজিত দত্তের মনোভঙ্গী বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। কাব্যে যাঁরা পুরাতন অবহেলিত ঐতিহ্য আমদানী করেন, তাঁরা নিজেরাও অনেক ক্ষেত্রে এই ভ্রান্তিতে পতিত হন যে তাঁরা নূতন কথা বলছেন। কাব্য-সমালোচকরা তো এ-ভ্রান্তিতে পতিত হবেনই। বিশ-শতকে নূতন কথা বলবার কিছুই নেই। আছে পুরাতন অনুভবকে নূতন রঙ মাখিয়ে উপস্থিত করার কাজ।

হিটলার যুদ্ধের মাদল বাজাচ্ছেন ত্রিশের শেষ দিকে। এলিঅটের সাহিত্য-সাধনা 'ক্রাইটেরিয়ানে'র তরী টলমল। প্রথম যুদ্ধাবসানে তাঁর 'থ্রি হুয়াইটেড লেপার্ড্স'-এর স্বপ্ন স্বস্তিকা-মার্কা আর্য্য ব্যাঘ্রের হলুদ-কালো ডোরায় রুশিয়ার লাল-প্রান্তরে রোদ পোহাতে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী দারুণ অস্বস্তি। রবীন্দ্রনাথ সে-সময়েই বাঙালী কবির মানস-মুকুরে শক্তির ছায়াপাত দেখতে উৎসুক হয়েছিলেন। প্রেমের প্রতিমা কেমন তৈরী হচ্ছে তা দেখবার অভিপ্রায় তাঁর ছিলনা। ১৯৩৯ সনে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'জেসন' লিখেছিলেন। গণতন্ত্রে আশ্বাস ছিল তাঁর, স্বৈরিণী-উরোপায় বিশ্বাস হারিয়েছিলেন।

বাঙালী কবির চিত্ত সে-সময়ে বাংলার ভূগোলের সীমা ছাড়িয়ে আপন সত্তার সন্ধান করেছিল ঐতিহাসিক জাতিতত্ত্বে। রবীন্দ্রনাথের লেখা সিন্ধুসভ্যতার ইতিবৃত্ত 'শিশুতীর্থ' কাউকে প্রেরণা দিয়েছে, কেউ বা স্বকীয় চেষ্টায় ইতিহাস অনুসন্ধান করে ভারতীয় সীমার বাইরে মহাভারতীয় এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছেন। ঘোড়-সওয়ারে আসক্ত

বিষ্ণু দে বা উর্ব্বশীতে নিরাসক্ত সমর সেন আত্মপ্রসারের কাজে দিক খুঁজে পাননি, যেহেতু তাঁদের মানস-মুকুল ছিল এলিঅটের কড়াই-এ।

কাব্যভাষার আইন-কানুনও শ্লথ হয়ে গিয়েছিল তখন। ভাষার মুক্তি যে কোন্ পথে সে চিন্তা ফুরিয়ে গেলেও কবিতার ভাষা-বন্ধন কোন্ পথে সে-কথাটি তখনও ফুরোয়নি। ছন্দো-বন্ধনে ভাষা আসতে চাইল অনেকের বিবেচনায় কিন্তু ভাষার প্রাক্তন শব্দ-ধ্বনি, অলঙ্কার বা যথেচ্ছ শব্দব্যবহার বর্জ্জন করে বাংলা-কবিতা তখনই ব্যঞ্জিত হতে চাইল। এ-ব্যঞ্জনায় সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন। এবং লেখকও খানিকটা সচেষ্ট ছিল, যেমন ঃ

> সূর্য্য তোমার গেলনা কুজ্ঝটিকা
> স্বপ্ন হলনা শেষ ঃ
> এখনো আকাশে অনেক অন্ধকার
> রাত্রি অনুর্ব্বর।

এ-পংক্তিগুলো সূর্য্যের প্রতি নিবেদন হিসেবে দুর্ব্বোধ্য। কিন্তু যুদ্ধোত্থিত পৃথিবীর সভ্যতার দিকে তাকালে সূর্য্যের কুজ্ঝটিকা যে শীতের কুজ্ঝটিকা নয়, সভ্যতা-সূর্য্যের কুহেলী কুয়াশা তা খুব সহজেই বোঝা যেতে পারত। তাছাড়া কিছু বুঝতে হলে আকাশ-বিজ্ঞান এবং নবজন্মের অভীপ্সা বোঝাতে হয়ত সমর্থ ছিল পংক্তিগুলো। জন্মের মূল কারণ নিয়েও টানাটানি চলছিল সে-যুগে। সমর সেনের 'গ্রহণ' ('কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতার সঞ্চয়) গ্রন্থ এ-যুগের কাবণের কদাচার বর্ণনায় মুখর, যেমন ঃ

> "অবশেষে শূন্যের সবাইখানায়
> ভ্রাম্যমান বিলোল দিন অদৃশ্য হয়
> পিছনে রেখে যায় শুধু কারণের গন্ধ
> কয়েক প্রহরের নিশাচর শান্তি।"

গন্থ-ভঙ্গীর অনিবার্য্য গতিবিধিতে তিনি রূপকল্প সন্ধান করেছেন সরাইখানায় কিন্তু 'কারণ' মন্থ 'কারণ' সলিল-ভঙ্গীতে এসে গেছে গাঙ্গেয় হাত বেয়ে, যখন তিনি বল্‌ছেন ঃ

"জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে
আকাশ-গঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে।"

ইতিহাস-পুরাণকে জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে কী প্রক্রিয়ায় কবিদের জড়ানো উচিত তা ষ্টিফেন স্পেণ্ডর অডেনের কাব্য-সমালোচনা প্রসঙ্গে এ-সময়ে বিবৃত করেন। এই দুই ইংরেজ কবি তখন বাংলাদেশে ঔৎসুক্যের সঞ্চার করেছিলেন। স্পেণ্ডর এলিঅট-ধর্ম্মী। কিন্তু ইংরেজী কাব্য-পাঠক ধর্ম্মে ও ইতিহাসে যতোটুকু ওয়াকিবহাল, আমাদের দেশের কাব্য-পাঠকরা তার শতাংশের একাংশও এই সংস্কৃতির ছায়া মাড়ান না। সুতরাং ইতিহাসদর্শী কবিরাও বাঙালী পাঠকের নিকট দুর্ব্বোধ্য থেকে যান। অজিত দত্ত এ-সময়ে 'ভোর হ'ল মোহেঞ্জোদারোতে' কবিতাটি অনর্থক লিখলেন, কারণ সৎ-ইতিহাসের পাঠক বাঙালী কাব্য-পাঠকরা নন। ইতিহাসকে রূপকথা করে তুলেছিলেন জীবনানন্দ। বহু তরুণচিত্ত সে-কাব্যে উৎসুক হল। অবশ্য তরুণ সমর সেনকেও মধ্যবিত্ত তরুণচিত্ততা 'ইস্কুল-মাষ্টার' করে তুলতে চাইল। তার একমাত্র কারণ তাঁর গন্থভাষণ এবং যৌবনবেদনারস। রোমান্টিক তিনিও কিন্তু ছন্দশীলতার কঠিন পথে এসে তিনি যুগোচিত ব্যথা-শোক-আর্ত্তি প্রকাশে অশক্ত ছিলেন। বিষ্ণু দে অপরপক্ষে ভেবেছিলেন যে রোমান্টিক হওয়া-না-হওয়া একটি পোষাক পরা-না-পরার মতো ইচ্ছাধীন। স্পেণ্ডরের কাব্যকৌশল-ব্যাখ্যা কাব্য-নির্ম্মাতাদের মতির উপর এমন ছাপ আনবার সুযোগ করে দিয়েছিল। রোমান্টিকতা একটি মনশ্চরিত্র। বাস্তবতার রাজ্যে বসবাস করেও যে রোমান্টিক হবার অনেক রাস্তা খোলা থাকে, তখনকার দিনের অনেক চরিত্র-

সাধক এ-কথাটি বিস্মৃত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতাকে এই বিস্মৃতির জন্যে দায়ী করা উচিত হবেনা। কারো কারো ধাতই থাকে অ-রোমান্টিক। তাঁরা রোমান্টিক কবিতা লিখতে গেলেও কৃতকার্য্য হননা। আর রোমান্টিকদের সুবিধে এই যে বাস্তবতায় বসবাস করেও তাঁরা চরিত্রভ্রষ্ট হননা।

চল্লিশের যুগে সবচাইতে সুস্পষ্ট বিরোধী সুর শুনিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ, যখন রবীন্দ্রনাথও বামপন্থাব স্নেহে দোলায়িতচিত্ত হয়েছেন। তবে বামপন্থার বীজ হঠাৎ হাওয়ায় উড়ে আসেনি। এসেছে রবীন্দ্র-বিরোধিতা থেকে, 'বিশের যুগে'র ভূমি থেকে। তাকে ঠিক কল্লোল-যুগ বল্‌বনা—বল্‌ব মোহিতলালের যুগ। মোহিতলাল, সজনীকান্ত, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ, যতীন্দ্র সেনগুপ্ত এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র এমন একটি চারাগাছ তৈরী করতে চেয়েছিলেন যাকে বিত্তহীন বাঙালীর বিদগ্ধ চিত্তের রূপস্বপ্ন আশ্রয় করতে পারে। চিরাচরিত বস্তু বাংলাকাব্যে কিছু না থাকলেও রবীন্দ্রনাথ কাব্যে একটি ধ্রুপদা লোক· প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; বলা যায়, এককাণ্ড দেবদারুপ্রতিম বোধিদ্রুম রচনা করেছিলেন যার শাখা ছিল স্তিমিতবাহু রবীন্দ্রাশ্রিত কবিবৃন্দ। বৃক্ষের কথাই যদি ভাবি তাহলে বলব যে উদ্ধৃত নামগুলো এই বৃক্ষকে বটবৃক্ষে পরিণত করেছে। কিন্তু একটি উড়ে পড়া বীজে মাটিতে যে চারাগাছটি জন্মেছিল তাকে পাষাণ-বন্দী করে পূজোপার্ব্বণের ধূম লাগিয়েছিলেন বামপন্থীরা। সুধীন্দ্রনাথ যে বৃক্ষের জন্ম দিলেন তা নবীন বলেই কচি-চারার মাটির রসও চিনত। যেদিন আকাশ থেকে বজ্রসম্পাত হল কাব্যারণ্যের উপর, সেদিন সুধীন্দ্রনাথের অলাতসদৃশ তরুটি অভিশাপ হানল কচি-চারাটির উপর। চল্লিশেব যুদ্ধকাল সে অশনিসম্পাত করেছে। উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের বিনাশকাল

বলে বাংলা কবিতা এই যুগটিকে স্মরণীয় করে রাখলেও আমার ব্যক্তিগত ধারণা অন্যরকম। উপমা বর্জ্জিত করলে কথাটা এই দাঁড়ায় যে যুদ্ধকাল আমাদের কাব্যকে বিচিত্র বর্ণে ও অভিজ্ঞতায় চিহ্নিত করে গেছে। যুদ্ধ-যুগের বাংলা-কবিতার সবচেয়ে বড়ো ঘটনা 'নিরুক্ত' (প্রেমেন্দ্র মিত্র ও লেখক কর্তৃক সম্পাদিত) কবিতা-পত্রিকার আবির্ভাব।

'নিরুক্তে' প্রেমেন্দ্র মিত্রের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথের প্রাক্তন বিরোধী দল বা বটবৃক্ষের শাখা-রচয়িতারা সবাই সমবেত হয়েছিলেন। কিন্তু 'নিরুক্তে'র শেষকাল পর্য্যন্ত এই সংগঠন টেঁকেনি। তবু 'নিরুক্ত'ই সেই শক্তি সঞ্চার করেছে যা 'বামপন্থী' চারাগাছটির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শেষ পর্য্যন্ত বিজয়ী। এ-বিজয় কবিতার ধ্রুব ধর্ম্মের। 'কবিতা' পত্রিকার সঙ্গে 'নিরুক্তে'র তুলনামূলক আলোচনায় বলা যেতে পারে যে 'নিরুক্ত' ঐতিহ্যগত পৌরুষ যাচ্ঞা করেছে কিন্তু 'কবিতা' পাশ্চাত্ত্যের পৌরুষে আসক্ত হয়ে গেছে। অবশ্য রবীন্দ্র পিতৃমুখাপেক্ষী উভয় পক্ষই ছিলেন। একথা বলা বাহুল্য যে সেদিনের 'জনগন্ধ' বা 'ফ্যাসিবিরোধী' সম্প্রদায় 'নিরুক্তে'র আবির্ভাবের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করাতে অসমর্থ ছিল। 'নিরুক্ত' অবশ্য গদ্যে-পদ্যে আপন অস্তিত্ববাদ প্রচার করতে কসুর করেনি, কিন্তু কাব্য-বোদ্ধারা এমনি যুদ্ধান্ধ বা অর্থান্ধ ছিলেন যে কবিতার সামাজিক শক্তি উপলব্ধি করবার চেতনা তাঁদের ছিলনা। চল্লিশের কাল বাংলা-কবিতায় রাহুযুক্তির ও রাহুমুক্তির কাল। রেনেসাঁস ও রিফর্মেশন নামক আন্দোলনদ্বয় মাত্র দশটি বৎসরে বাংলা কবিতা সুসম্পন্ন করেছে চল্লিশের যুগে।

ইরাস্মাসের রেনেসাঁস যুদ্ধোন্মাদ উরোপায় যে মানব-ধর্ম্ম নিয়ে সংস্কৃতির রণশ্বাস প্রশমিত করেছিল তার তুলনা শ্রীগৌরাঙ্গের সময়ে ছাড়া ভারতবর্ষে মৌর্য্যযুগের পর পাওয়া যাবেনা। রবীন্দ্রনাথও আজীবন মধ্যযুগীয় মানবতার পরিপোষক হয়ে ভারতীয় সাংস্কৃতিক

পরিমণ্ডল খানিকটা নিয়ন্ত্রিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সাফল্যমণ্ডিত না হলেও মানবতা-ধর্ম্ম দেশে-বিদেশে প্রচার করে ভ্রমণ করেছেন ঠিক ইরাস্মাসের মতো।

তাঁর আজীবন সাধনা যুদ্ধোদ্যমে বিনষ্ট হল। তবে তিনি তখন যে 'ছড়া' কাটতে লাগলেন তার মারফত বাংলা সাহিত্যে ল্যাটিনিটিও প্রকাশিত হল। শুধু সাহিত্যেরই দিক প্রকাশ নয়, বাঙালী চরিত্রের জাড্য ও কলহ যে দুরপনেয় তা-ও এই ছড়াগুলোর মারফত ব্যক্ত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের দরবারে মানবতা-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলেও আশা করছিলেন যে অন্তত বাংলাদেশে তাঁর এই ধ্রুপদী ধর্ম্মটি প্রবর্ত্তিত হবে। কিন্তু সে-আশাও বাঙালী চিত্তের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে ডুবে যেতে সুরু করল।

কবিতা কার জন্যে এই পুরনো জিজ্ঞাসা বাংলাদেশের ত্রিশের যুগে উত্থাপিত হয়ে যে মীমাংসার পথই দেখিয়ে থাকুক, যুদ্ধময় পৃথিবীতে যখন চতুর্থ দশক দ্বার-উন্মোচন করল তখন দেখা গেল যে যুদ্ধের জন্যেও কবিতা হয়। তারপর রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাঙালী কবিদের অনেককেই জাতি-দায়িত্বশীল করে তুলল। মন্বন্তরে প্রচুর কবিতা লেখা হ'ল। দায়িত্বশীল কবি ছাড়াও অনেক নবীন-প্রবীণ কাব্যপ্রবণ ব্যক্তি এ-সময়ে বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট কবিতা দান করেছেন। যুদ্ধ, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু, মন্বন্তর প্রভৃতি দুর্যোগ বাঙালী জীবনের জাড্য-দোষ ঘুচিয়ে সাহিত্যে যেন একটি এলিজবেথীয় যুগ এনে দিতে চাইছিল। এ-যুগে আবেগ ও যুক্তি বাঙালী চিত্তে পাশাপাশি বসবাস করতে সুরু করেছে।

ইরাস্মাসের নিঃশ্বাস শুধু যে প্রেমেন্দ্র মিত্র-সম্পাদিত 'নিরুক্তে'র মনোভঙ্গীতে প্রকাশিত হয়েছে তা নয়। অতীত থেকে একটি ধ্রুপদাভাস গ্রহণ করবার বৃত্তি বেশির ভাগ কবির মনেই জাগ্রত হয়েছে এ-সময়ে। কিন্তু আনন্দ-ভুঞ্জনের জন্যে অতীতের অরণ্যে বা শ্মশানে কেউ প্রস্থান করেননি, বর্ত্তমানের বীভৎসতার

সঙ্গে অতীতের কী সম্পর্ক বিদ্যমান তারই অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন অনেক কবি। যুদ্ধ তার বিভীষিকাকে যদিও অতিশয় বাস্তব করে তোলেনি ১৯৩৯-এ মারণাস্ত্রের বা কৌশলের লীলায়, তবু অনুভূতি-প্রবণ কবি আহত স্নায়ু নিয়ে যেন বলতে পেরেছেন তখনও : "আমরা কি বুঝি কোথা পৃথিবীর আদি আর্ত্তনাদ ?"

সুধীন্দ্রনাথ যুদ্ধের চার মাস আগে দিনেশ দাসের বিখ্যাত 'কাস্তে' কবিতার অপ্রকাশিত ধ্বনিটি উচ্চারিত করলেন এই বলে :

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে।
ছায়াপথে কোন্ অশরীরী উন্মাদ
লুকাল আসতে আসতে ? (১৯৩৯-১০ই মে)।

নজরুল ইস্‌লাম সৈনিক-বৃত্তিতে একবার বিদ্রোহী হয়ে 'হল বলরাম স্কন্ধে' লাঙ্গল পত্রিকা বার করেছিলেন। বাংলা কবিতায় তখনই বিদ্রোহী সুরের জোয়ার এসেছিল। এ যেন কৃষাণ বিদ্রোহ। সে-বিদ্রোহের সুর যেমি দিনেশ দাসের কবিতায় 'কাস্তে'র মারফত শোনা যাচ্ছিল, তেমি নজরুল-মানসিকতাসম্পন্ন অজয় ভট্টাচার্য্যের 'সৈনিক' গ্রন্থে, কামাক্ষীপ্রসাদের 'মৈনাক সৈনিক হও' কবিতায় এবং আরো অন্যান্য অনেকের সেনা-কাব্যে দ্বিতীয় যুদ্ধের পরিবেশে জমে উঠছিল। কিন্তু যুগের এই আবেগ প্রবণতাকে সমালোচনার নিক্তিতে তুলে কাব্য-রচনা করার কাজ সুধীন্দ্রনাথই প্রথম করলেন। পরে ১৯৪০-এ 'ছড়া'য় এ-কাজ রবীন্দ্রনাথও করেছেন। কোনো প্রবল আবেগে যখন যুগ-চেতনা উৎক্ষিপ্ত তখন তার ভালোমন্দ বিচারের শক্তি আবেগেপ্রবণ কবি-সম্প্রদায়ে থাকেনা। এ-শতকে দ্বিতীয়বার সামরিক যুগ এসে বাঙালীর আবেগপ্রবণ চিত্তের যে ছবি দেখিয়ে চলেছিল তার স্রোতোমুখে যুক্তি-বিচারের বাধা উপস্থিত করা ভালো কি মন্দ, সে-বিচারও সেদিন হয়ত খুব বেশি কবিতা-পাঠক দেখাতে রাজি হননি।

পেছনের দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে আজ আমরা বল্‌তে পারি যে কবি নূতন কথা শোনান না। তিনি 'বাগ্‌-গেয়কার' বা বাগ্মী হলেও নূতন তথ্যে সমাজকে মন্ত্রমুগ্ধ করতে এগিয়ে আসেন না। তিনি একটি যুগের বাঙ্ময় প্রতিনিধি মাত্র। যুগবৃক্ষ একটিই থাকে, তাকে উপলক্ষ্য করে অবশ্য তৈরা হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে যুগবৃক্ষ অপর কারো হবার সম্ভাবনা ছিলনা। তবে, কলমের চারা হয়েছে, যেমন 'কবিতা' পত্রিকা। তেম্নি আরেকটি কলমের চারা তৈরী হল 'নিরুক্ত' পত্রিকা।

'যুগের মর্ম্মকে অস্বীকার করে নয়, তাকে নিজস্ব নূতন ব্যঞ্জনা দেওয়া'র যে ধ্রুপদী রেনেস্যাঁসের কাজ তা-ই 'পূর্ব্বাশা' এবং 'নিরুক্ত' কর্ত্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল। অতীতের যেটুকু শ্বাস বর্ত্তমানে এসে রূপায়িত হচ্ছে তাকে গ্রহণ করে মূর্চ্ছিত করবার অভিপ্রায় জাগ্রত থাকে সমাজচেতন শিল্পীর মনে। অতীত জাতিতত্ত্ব, সংস্কৃতির সমন্বয় ও বিরোধ যাদের মনে পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট নয়—শুধু বর্ত্তমান ছাড়া অগ্রপশ্চাতের সব দৃশ্য যাঁদের দৃষ্টিতে বিলুপ্ত, তাঁরা না পারেন শিল্পী হতে, না শিল্পবোদ্ধা হতে। অতীত যাঁদের নিকট ব্যঙ্গ্যের বস্তু, ব্যঞ্জনার বস্তু নয়, তাঁদের শ্রেণীর নাম সভ্যতার অভিধানে নেই।

যুদ্ধের প্রথম মাসে নাৎসী-বিরোধী একটি সংখ্যা প্রকাশ করে কয়েক বৎসরের জন্যে 'পূর্ব্বাশা' অপ্রকাশিত থাকে। বেন জনসন বিফর্মেশনের আওতায় যে-চিত্তে বলেছিলেন: 'Light, I salute thee, but with wounded nerves....' তেমন চিত্তভার বহন করেই আমরা সেদিন বলেছিলাম:

"বাতাসে পেয়েছি মৃদু সুরভিত শেফালিকা-স্বাদ,
আমরা কি বুঝি কোথা পৃথিবীর আদি আর্ত্তনাদ!"

(১৯৩৯-সেপ্টেম্বর)

কিন্তু একা 'পূর্ব্বাশা'র বাক্ রুদ্ধ হয়ে গেলেই কি স্তম্ভিত হবে

বাংলাদেশ? সেই বাংলার ছবি রবীন্দ্রনাথের 'ছড়া'র দু'টি পংক্তিতে এ-রকম:

"সিন্ধুপারে মৃত্যুনাটে চলছে নাচানাচি,
বাংলাদেশের তেঁতুলবনে চৌকিদারের হাঁচি।"
(১৯৪০-১৫ মে)।

সামরিক কাণ্ডে কিন্তু সমর সেন তখনও অবতীর্ণ হননি, তিনি চতুরঙ্গে 'কাণাকড়ি'র ছক পেতেছেন তখন:

"কয়েকটি শেষ খোঁয়াড়ের কড়ি গুণে
ছিন্নভিন্ন সময়ের জালে
বন্যার জলে মাছ ধরা।" (চতুরঙ্গ—১৯৩৯, সেপ্টেম্বর)।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ এই সমর সেনের উপর অত্যন্ত আস্থা চাপিয়ে দিয়ে তাঁকে বন্যাতুর্দ্দশায় ফেলে দিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসু যুদ্ধের প্রথম তাঁর 'সমস্যা' কবিতাটি প্রকাশিত করেন। কোন্ পথ অবলম্বন করবেন, এ-সমস্যায় তখন তাঁর চিত্ত দোলায়িত।

কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ সম্ভ্রান্ত স্পেন্সারের মতো 'নিরুক্তে' যখন তাঁর 'শর্ব্বরী' কবিতাটি লিখলেন তখন সুধী ব্যক্তিমাত্রেরই চিত্তাকাশে ইতিহাসের ট্রাজিডি প্রতিভাসিত হল। যেন এ-কবিতা লিখবার আগে তিনি স্পেন্সারের মতো এ-কথাগুলোও উচ্চারণ করে নিয়েছিলেন:

"So oft as I with state of present time
The image of the antique world compare."

এবং মিশর-সভ্যতা থেকে সুরু করে বর্ত্তমান নাগরিক জীবনের উত্থান-পতন ও স্থিতির কথা ভেবে তিনি শেষ পংক্তিতে বলেছিলেন: "দুঃস্বপ্নের বিপর্য্যয়ে নিশি জাগে শুধু অন্ধ হানি।"

স্পষ্টতই শোক এবং করুণরস উত্থিত হয়েছে 'শর্ব্বরী' থেকে। স্পেন্সারের পৃথিবীতে "first blossoms of faire vertue bare" ছিল। কিন্তু আমাদের নগর-পল্লী তা অপচয় করেছে। রবীন্দ্রনাথও হয়ত সে-সুঘ্রাণ পেয়ে তাঁর বুক্ষে সুরভিত ফুলশয্যা তৈরী করতে পেরেছেন কিন্তু আমাদের স্বকীয় উপলব্ধিতে সে-সুঘ্রাণ আসেনি। সৌন্দর্য্যের যেন অপঘাত-মৃত্যু হয়েছে, এই অনুভব বহন করে ত্রিশের অন্তিম বছরগুলোতেই আমরা বিষণ্ণ হয়ে পড়েছি। ফলে এই আক্ষেপ :

> "আমরা পাইনি এসে পৃথিবীর প্রথম যৌবন
> আকাশে হারিয়ে গেছে কতো কথা তরুণ তারার
> কতো নীল অন্ধকার, ম্লান কতো সূর্য্যের স্বপন,
> জ্যোৎস্নায় জাগর রাত, রাতেরো তা মনে নেই আর।"

বস্তুত দুই যুদ্ধের বাহুপাশে যাঁদের জন্ম-জীবন-যৌবন কাটতে চলেছিল, তাঁরা অতীতে তাকিয়ে স্বভাবতই সৌন্দর্য্যের অপঘাত-মৃত্যুর ছবি দেখবেন। ম্যাথু আর্নল্ডের ভঙ্গীতে তখন জীবন-বিচার করতে গেলে আমরা দেখতে পেতাম :

> "....this iron time
> Of doubts, disputes, distractions, fears."

সেই গ্রীসীয় হিংস্র-উন্মাদনায় 'জেসন'-বৃত্তিতে মুক্তির সন্ধান পেলেন একমাত্র সুধীন্দ্রনাথ। সন্ধানলব্ধ মুক্তা 'রমণীর দয়া'—কিন্তু তেমন দয়াময়ী নারী তৈরীর পথ বনেদী বামপন্থা রুদ্ধ করে চলছিল। আমরা আজ অকুণ্ঠচিত্তে বলতে পারি যে চল্লিশের যুগের কবিচিত্তের প্রধান 'গায়েন' ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ।

বনেদী বামপন্থা প্রেমকে স্বপ্নসম্ভব জেনে বাস্তব যাত্রা সুরু

করেছিল। যেমন বিষ্ণু দে এ-দলে, তেমনই সুভাষ মুখোপাধ্যায়। প্রেমহীনতার ধ্বনি শোনালেন সুভাষ প্রেমকে ফুল-খেলার সামিল ভেবে। তাঁর বক্তব্যে প্রচ্ছন্নতা ছিলনা। তিনি স্পষ্টভাবে বললেন :

"প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখী আমরা
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাট ফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।"

রীতিমত পুষ্পবর্গে বৌদ্ধ বিতৃষ্ণা—iron time-এর 'fear' থেকে যা জাগ্রত। রূঢ়ভাষী সুভাষ দ্বান্দ্বিক তৃতীয় দশকের স্বাভাবিক পরিণতি। যেমন উপনিষদের পরিণতি নারী-বিদ্বেষী গৌতম বুদ্ধ, তেমনই বামপন্থার সাহিত্য-রূপের শেষ রূঢ়তা সুভাষে প্রতিফলিত। এ-ও 'ম্যান অব সেন্সিবিলিটি' বা রোমান্টিক কবির একটি তির্য্যক মনোভঙ্গী। তারপর সুকান্ত বা বিমলচন্দ্র ঘোষ আমাদের চিত্তে বিশেষ নবীন মনে হয়না। 'ক্ষুধিত জাগুয়ার যেন এপ্রিলের বসন্ত আজ' (সমর সেন) কিম্বা 'শহরের বসন্ত ঘোরে বুইক বেঞ্জ বেলিলার চাকায়' পর্য্যন্ত সম্ভবত সজীব মৃতুতার সীমান্ত ছিল, কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'সেই সীমান্ত এমনই অনিশ্চিত' (অরুণ মিত্র) ভাবলেন যে 'শ্রদ্ধানন্দ পার্কে' 'মহাজনী খতে' 'ইতিহাসের অর্থ-নীতিতে' লাল-উল্কিতে সৈনিক সেজে ফিরতে লাগ্‌লেন। অবশ্য সমাজের মনে তখন বামপন্থা 'উজ্জ্বল উষার ঠিকানা' ('ঘরে-বাইরে' —পদাতিক) দিতে সুরু করেছিল খুব ত্বরিতবেগে। আজ অসঙ্কোচে বলা যায় : সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে আদ্যোপান্ত সদন্তঃকরণের পরিচয় দিয়েছেন, অন্য অনেক সৈন্যই সে-পরিচয় অম্লান রাখতে পারেননি! তার বহুবিধ কারণের মধ্যে একটি কারণ হল এই যে হৃদয়বৃত্তিকে নষ্ট করা অনেকের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনের দিনে এবং 'মন্বন্তর'-এর লঙ্গরখানার যুগে।

সুধীন্দ্রনাথ 'কুইট ইণ্ডিয়া'র পর ১৯৪৫-এ 'সোহংবাদ' সনেটটি লিখে আপন আত্মার কর্তৃত্ব ঘোষণা করেন। আত্মা মানে আত্মস্বরূপ বা সত্তা। সর্ব্বাস্তিবাদ যদি বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের পরের ধাপ হয় তাহলে তার প্রতি ধাবমানতা ঔপনিষদীয় এবং ভারতীয় ঐতিহ্য। অন্তত চতুর্থ দশকের শেষভাগে স্বাধীন ভারতের আব-হাওয়ায় সর্ব্বাস্তিবাদের শ্বাস প্রশ্বাস ছিল। সমগ্র জীবনকে যদি আমরা কোনো দার্শনিক দৃষ্টিতে অবলোকন করে যাচাই করতে চাই তাহলে অকপটে বলতে হবে যে জীবনের সত্তা দু'টি স্রোতে অনুভূত। একটি অপরিচ্ছন্ন এবং অপরটি পরিচ্ছন্ন। পঞ্চেন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা অপরিচ্ছন্ন হতে থাকে অন্তঃকরণ সক্রিয় না হলে। অন্তঃকরণ পরিচ্ছন্নতা দান করবার চেষ্টা করে। এই দানটুকুই সৃষ্টি। অন্তঃকরণ বহুবিধ অভিজ্ঞতা থেকে কোন্ বিশেষ বস্তুকে পছন্দ করে' পরিচ্ছন্ন করতে থাকবে তা যখন জানবার উপায় নেই তখন কবি বা শিল্পী সোহংবাদে যেতে বাধ্য হন। তিনি আপন আত্মদর্শনে বা নিজের মনোদর্পণে অভিজ্ঞতাগুলোর কার্য্যকলাপ দেখে একটা পরিচ্ছন্ন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা পেতে ইচ্ছা করেন। অভিজ্ঞা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে তিনি তা যখন ব্যক্ত করতে যান, তখনই তাতে সৃষ্টির আমেজ আসে। Fixation কথাটি শিল্পের ক্ষেত্রে জরুরী। যে-অভিজ্ঞতা সহজে Fixed হয়, মানে, মনঃক্ষেত্রে যে-ধ্বজদণ্ড সহজে সুপ্রোথিত হয়, যে-ভাবটি অতি দ্রুত লয়ে এবং অবলীলায় অন্তঃকরণ-যন্ত্রে পরিশ্রুতি পায়, তারই শিল্পকাবিতা বেশি। প্রেম তেমি একটি ভাব। অন্তত সাহিত্য-শিল্পীরা এই ভাবটিকে সবচাইতে বেশি রূপায়িত করেছেন। কিন্তু চল্লিশের যুগে প্রেম ছাড়াও অন্যান্য ভাব কবিচিত্তে চৈত্য-ধ্বজছত্র হবার উপক্রম দেখিয়েছে।

'কবিতা'-পত্রিকা কিম্বা নব-প্রতিষ্ঠিত 'নিরুক্ত' প্রেমব্যতিরিক্ত অন্যান্য অভিজ্ঞতার পরিচ্ছন্ন রূপ-প্রাপ্তির পথ খোলা রেখেছিল।

কিন্তু এক দক্ষিণপন্থী জীবনানন্দ দাস ছাড়া প্রেম-পরিত্যাগী বামপন্থী কেউ তেমন কোনো অভিজ্ঞতার পরিচ্ছন্ন ও হৃদয়গ্রাহ্য মূর্ত্তি স্থাপিত করেননি। তাঁর কবিতায় তখন মৌলিক ও কৌলিক স্বাদ এই কারণেই বেশি অনুভূত হয়েছে। তিনি তাঁর বিনম্র বিশ্বাসের কলেবর তৈরী করেছেন। তা ইতিহাস-চেতনাই হোক আর ভূতত্ত্বই হোক কিম্বা ভুখালোকই হোক, কাব্যের পোষাকে তা প্রীতিধাবার মতোই রূপস্বপ্নময়। ১৯৪৫-এ সুধীন্দ্রনাথ প্রেমে প্রত্যাবৃত্ত হয়েছেন। ফ্রেঞ্চ কবির প্রভাবে তাঁর লাতিন-চিত্ত দিব্যভাবাপন্ন ছিল, আলোকিত আর রুদ্র ছিল প্রেমের দ্বৈত-চক্ষু ও দৃষ্টি এবং তার অনুভবেই অমরত্ব-চেতনায় তিনি উদ্বোধিত হয়েছিলেন। 'অর্কেস্ট্রা'র অভিজ্ঞতা বা প্রেমের সপ্তপদস্থতি সুধীন্দ্রনাথ পূর্ব্বে নিবেদন করেছেন। এ সময়ে জার্মান হাইনে অবলম্বনে প্রেমের কালো খবর সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছিলেন। অতঃপর যুদ্ধান্তে তিনি 'সোহংবাদে' নিশ্চয়ই বলতে পারেন: 'নিখিল নাস্তির মৌনে সোহংবাদ করেছি ধ্বনিত।' বৌদ্ধ শূন্যতা নিয়ে ব্যক্তিমন, কাব্যমন, সমাজমন বাঁচতে পারেনা, যদিও প্রজ্ঞাবান্ জানেন যে শূন্যতাই শেষ-পরিণতি। ব্যক্তি-কর্ত্তৃত্ব বা পুরুষকার নামক একটি মানবীয় মনোতরঙ্গ প্রেমের সামিল করে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় সম্প্রতি স্থাপন করতে উন্মুখ। সজীব মূর্ত্তি স্থাপনই কাব্য-সৃষ্টি।

'সোহংবাদ' (ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য) চতুর্থ দশকের দান নয়। তবু রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা যখন অনায়াসেই সোহংবাদ দান করতে পারে, আমরা কাব্য-ক্ষেত্রে তাকে তখনই সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাই। অবশ্য 'নিরুক্ত'-সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্র বৃটিশ সম্রাটের যুগেই আত্ম-প্রতিকৃতিতে সম্রাট-লক্ষণ অনুভব করেছেন এবং 'নিরুক্তে'র প্রথম বর্ষের শেষ-সংখ্যায় 'জয়' কবিতায় মনোভঙ্গীটি সুস্পষ্ট করেছেন 'ঊর্দ্ধশ্বাস রূপান্তর' বলে। মৃত্যু-চেতনা মনে বহন করেও বিদ্রোহী

ভঙ্গী থেকে যে তিনি পৃথক, তা-ও এ-কবিতায় ব্যঞ্জিত হয়েছে। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্রাট-লক্ষণাক্রান্ত কবিতা তরুণ-চিত্তে যে আলোড়ন এনে আত্ম সচেতন রাজচক্র তৈরী করেছিল সে-কালে তার দৌরাত্ম্য এখনও বিদূরিত নয়। আমার মনে হয়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাম্রাজ্যবাদ তখন একটিমাত্র কবিতায় তির্য্যকভঙ্গীতে কাব্যগত সার্থকতা লাভ করেছে। তখনকার তরুণতম কবি অমল দত্ত 'তুমি' কবিতাটিতে অহংবাদকে যে তির্য্যক-গতিসম্পন্ন করেছেন তা সত্যি উপভোগ্য। তির্য্যক বিন্দুটি এ-রকম:

> "হায় প্রিয়া,
> জেনো এই মৃত্যু অহঙ্কার:
> আমার জীবন দিয়ে তোমার সম্ভার।"

কবিতার রাধা-রস এখানে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মনোগত রসের বাম দিকে বাহিত। কবি-কর্ম্মে বামপন্থা বা শিষ্যত্ব এমন হলেই মানায়। 'নিরুক্তে'র প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় তরুণ কবি মণীন্দ্র রায় এই ধরনের একটি চমৎকার কবিতা রচনা করেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল জীবনানন্দের কাব্যাদর্শ যা রূপকল্পে বিমূর্ত্ত হয়ে যাচ্ছিল। একটি তীর ছুঁড়ে তিনি যেন জীবনানন্দের 'নারী' বা 'রমণী'কে সৎ ও পরিচিত পরিবেশে নিয়ে এলেন। চন্দ্রাবলীটি এমন:

> "কুড়ি বছরের কপালে চিন্তারেখা:
> শীতের সকালে কুয়াশায় ভেজা যেন মাকড়সাজাল।
> কুড়ি বছরের যৌবন যেন বালবিধবার সাজ।
> মাটি খুঁড়ে দেখ' আছে নাকি তার লেখা
> হৃদয়ে প্রেমের স্তূপীকৃত কঙ্কাল!
> বোলতার মত ক্ষীণকটি মেয়ে। পুরানো বইয়ের মত
> সান্ধ্যনেত্রা: মেরুপ্রান্তিক চাঁদের হলদে সাজ।

এই বাংলার মেয়ে রূপকল্পের ভূষণেও সেদিনের একটি অত্যন্ত বাস্তব সত্তা। রূপকল্প এখানে নবীন অথচ উৎকট নয়। রূপকল্পের নবীনতা যদি কাব্য-প্রতিভা নিরূপিত করে তাহলে মণীন্দ্র রায় ১৯৭২-সনের প্রতিভাস্ফুরিত কবি। কিন্তু কাব্য-প্রতিভা বস্তুত রূপকল্পে সর্ব্বত্র রসের সন্নিকর্ষ লাভ করতে পারেনা। পারেনা, পাঠক-চিত্তে রূপকল্পের উৎসমুখ কোথায় তা অজ্ঞাত বলে। পরিচিত পরিবেশ থেকে যদি কাব্যের এসব অলঙ্কার তৈরী হয়ে না আসে তাহলেই পাঠক কবিকে দুর্ব্বোধ্য আখ্যা দেন। জীবনানন্দ ঠিক তেমন দুর্ব্বোধ্য কবি। এজ্রা পাউণ্ডও দুর্ব্বোধ্য হয়েছেন এবং এলিঅটও দুর্ব্বোধ্য ছিলেন একই কারণে। কবির শক্তি দশদিকে প্রসারিত—এ নিয়ে বিতণ্ডা চলে না। পাঠক যদি দশবল বা দশভুজ কবিকে উপভোগ করতে চান তাহলে তেমন ভক্ত-পুরোহিতই তাঁদের হতে হবে।

যুদ্ধের অবসানে অনেকেই ব্রিটিশের 'বেতার-কেন্দ্র' থেকে শান্তির ও স্বস্তির কবিতা পাঠ করেছেন মিছিল বার করেছেন, কিন্তু হয়ত কোনো কোনো কবি একান্তে বসে ভেবেছেন: এ-যুদ্ধ কার, জয়-পরাজয় আর কার হ'ল ক্ষয়-ক্ষতি। অন্তত আমাদের মনে পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের ছড়ার ছন্দের ধ্বনি:

> "ঘুলিয়ে গিয়েছে তার বেবাক খবর
> জানিনে তো কে যে কারে দিচ্ছে কবর॥"

যাঁদের তা মনে পড়েছে তাঁরা ভেবেছেন: যুবক মানুষ জীবিত কেন এবং বিজয়ী কিসের জন্যে? 'জুবইহ মাণস্য কেন উবিজ্জই?' কিসের এই উজ্জীবন? তারপর বাংলার পক্ষে প্রেমহীন স্বাধীনতা-প্রভাত এলো।

১৯৪৫-এ সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়াতে 'নিরুক্ত' প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় এবং 'পূর্ব্বাশা' পুনঃপ্রকাশিত হতে সুরু করে

স্বাধীনতার প্রাক্কালে। 'নিরুক্তে'র সর্ব্বশেষ সংখ্যায় 'এ-যুগের কবিতা' প্রবন্ধে আমরা তখনকার কাব্য-বিচার করতে গিয়ে বলেছিলাম :

"... আজকের দিনের বাংলা কবিতাব বাঁচাকে অস্বাভাবিক না বলে উপায় নেই। তার কারণ, পাঠকের ঔৎসুক্যে নয়, কবিদের অপরাজেয় উৎসাহেই কবিতা আজ বেঁচে থাকবার প্রয়াস দেখাচ্ছে। শুধু তাই নয়, আধুনিক বাংলা কবিতায় এমন একজন কবির অন্তত সন্ধান পাওয়া যাবে যিনি কবিতাকে সাহিত্য-সৃষ্টির বাহন রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চান; যুগের মননেব ও হৃদয়ের প্রত্যেকটি তরঙ্গকে যিনি কবিতার ভাষায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করছেন।... ..."

বলা বাহুল্য যে দ্বিধাদ্বন্দ্বসমাকুল জীবনানন্দ সম্পর্কেই এই উক্তি ছিল তখন আমাদের।

তারপর দাঙ্গা ও স্বাধীনতার ঊষাকালে 'পূর্ব্বাশায়' অজিত দত্ত 'সোহংবাদ' ব্যতিরেকে শোনালেন কবির অন্য চরিত্র-কথা :

"কেমন করে কী সৌভাগ্যে জানি
সবারই দান সবারই ঋণ পেলাম অনেকখানি
হৃদয়ভরা সে-ঐশ্বর্য্য মুহূর্ত্তে ফুৎকারে
বিলিয়ে দিলাম সবার দ্বারে দ্বারে।" (দেনদার)।

বাংলাদেশের 'ভাঙা ঘরের গান' কবিতায় আমরা সে-সংখ্যাতেই লিখেছিলাম :

"আমাদের ভাঙা ঘরে, ভাঙা মাঠে, আকাশের আনাচে-কানাচে
মনের অনেক ছায়া
ছায়ার মতন বেঁচে আছে।
জীবনের ছোট ছোট রোদ নিয়ে ছবি আঁকে এখনো সময়,
চকিতে চোখের মায়া
হৃদয়ের আশেপাশে বুঝি জেগে রয়।" (১৩৫৪)।

'নিরুক্তে'র উদ্যোক্তা ও প্রধান সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্রও তখন 'ফেরারী ফৌজে'র সন্ধানে বেরিয়েছিলেন, যারা তাঁকে বালক-বয়সে রাজা হারুণঅল রসিদ বানিয়ে তরুণ বয়সে 'সম্রাটে'র আসনে বসিয়েছিল। সেই ফেরারী ফৌজ প্রেমানুভূতি। বুদ্ধদেব বসু একই আত্মস্থতায় প্রেম অনুভব করেছেন এবং জীবনানন্দ দাস 'সাতটি তারার তিমিরে' ভিন্ন আলোর রেখা-বিন্দু সন্ধান করেছেন। অচিন্ত্যকুমারের 'নীল-আকাশ'-এর একটি বৃহৎ অংশও 'নিরুক্তে'র পৃষ্ঠায় রচিত। মোটের উপর, চতুর্থ দশক রবীন্দ্রোত্তর কাব্যের জয়যাত্রার যুগ। সে-যাত্রায় বিচিত্রের মেলা—নবীন কে, প্রবীণ বা কে নয়, তা যেন বোঝা মুস্কিল ছিল। প্রেমের সুর এবং অপ্রেমের বেসুর ১৯৪৫-এর 'নিরুক্তে' কবিদের চিত্তে সমান জায়গা পেয়েছে। 'কবিতা'র যোগ্যতম তরুণ-কবি অশোকবিজয় রাহা ও বিশ্ব বন্দ্যো-পাধ্যায়ের সহচর বহু তরুণ কবি ও 'নিরুক্তে' আত্মপ্রকাশ করেছেন। তবে রামেন্দ্র দেশমুখ্য, আবুল হোসেন এবং অশোক মিত্র 'নিরুক্তে'র পৃষ্ঠায় জীবনকে দ্বন্দ্বহীন, অন্ধকার-বিমুক্ত ভাবতে পারেননি জীবনানন্দের উত্তর-সাধনা মনে বহন করে'। কিন্তু গোপাল ভৌমিক, নরেন্দ্র মিত্র, নীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, প্রজেশ রায় এবং নরেশ গুহ তখন বিচিত্র রূপকল্পে প্রেম-কাব্য ধর্ম্ম প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন।

কোনো সময়কে অবাস্তব ও বাস্তব ভাবার বা বানিয়ে নেবার কর্ত্তা কবির মন। কবির হৃদয় বলে' মনের থেকে আলাদা কিছু আছে কিনা জানিনে। মন হারিয়ে যায় বিষাদে ও নৈরাশ্যে, আবার তা ফিরে আসে হর্ষে, আশায়, স্থৈর্য্যে। এই চাঞ্চল্যকর অবস্থায় কবির মন যেতে বাধ্য। অবস্থা বিপরীত হয়েই তরঙ্গায়িত করে মন। দ্বৈতবাদ বা দ্বৈধভাব বড়ো চমৎকারভাবে বসবাস করে কবি-মনে সবসময়—সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে। কালজড়িত মনই হৃদয়ের চেহারা দেখায়, দেখায় মননের ছবি। সুতরাং যে

নাস্তিবাদ শুনিয়েছেন বুদ্ধদেব তাঁর কবিতায় তা চিরস্থায়ী নয় বলে আমরা মনে করব। মনে করব যেহেতু '৪৬ সনে তিনি লিখেছিলেন 'বাসা-ভাঙার গানে' হীরক-চোখের আশার কথা। সে-আশা ভঙ্গই যে কবির জীবনের সব স্বপ্ন ভগ্নদশায় আন্‌বে তা এখনও মনে করতে পারিনে আমি। বুদ্ধদেব চল্লিশের বছরগুলোতে যে নৈরাশ্যে ও শূন্যবাদে হারিয়ে যাচ্ছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ সে-সময়ে অকল্পিত গাত্রোত্থান দেখিয়েছেন। 'নাস্তিপ্রত্যাখ্যাত হয়ে' 'আকাশত্নহিতা' যে 'গূঢ় দৈববাণী রূপে' ফিরতে পারে সে-ঘোষণা সজোরে তিনি ১৯৪১-এ 'বিপ্রলাপ' কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। তাই তিনি চল্লিশের বছরগুলোর নেতৃস্থানীয় বাগ্মী ও স্মরণীয় কবি।

পঞ্চম দশকের কাব্যোদ্যম

কবিকে সাহিত্যিক কৌলিন্য দান করবার সাধ্য একা রবীন্দ্রনাথের ছিল কিনা সন্দেহ। তাঁর সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে কবিতা রচনার প্রবণতা যদি প্রবল না হ'ত (অবশ্য সে প্রাবল্য রবীন্দ্রনাথেরই উদাহরণে) এবং পরেও কল্লোল-প্রগতি-কালিকলম প্রভৃতি সাময়িক সাহিত্য-পত্রিকার মারফৎ যদি নূতন প্রেরণায় কাব্যস্রোত প্রবাহিত না হ'ত তাহলে কবিকৃতি আজকের দিনের মতো সহানুভূতি ও সহৃদয়তা লাভ করত কিনা সন্দেহ। কল্লোল-আন্দোলন শেষ হয়ে যাবার পঁচিশ বছর পর আজ অন্তত পঁচিশজন তরুণ কবির রচনা পড়ে আমরা সত্যিকারের কাব্যাস্বাদ লাভ করতে পারি। এ তরুণ কবিরা নেহাৎ-ই এখনকার কবিতার দিক্‌নির্ণায়ক —কল্লোলোত্তর যুগের নৈরাশ্য, বলিষ্ঠতা এবং প্রতীকানুরাগ কল্লোল-যুগের বাস্তবনিষ্ঠার সঙ্গে সমন্বিত হবার পথ যেন খুঁজে পাচ্ছে এখন।

নৈরাশ্য পুরোপুরিই তরুণদের মন অধিকার করে আছে। নৈরাশ্য ভাবটি যে ব্যথামধুর রস নিবেদন করতে সমর্থ এই ধ্রুপদী সত্যের ছবি আজকের বাংলা কবিতা পাঠ করে কবিতা-পাঠক মনে-মনে উপলব্ধি করতে পারেন। নৈরাশ্যের মনোভাব দু'ধরনের ফল প্রসব করে। স্নায়বিক দুর্ব্বলতাই যখন নৈরাশ্য-ভাবের জন্মদাতা, দুর্ব্বলতার উত্তরাধিকার নিয়ে নৈরাশ্য তখন মনের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দু'টি বাহু বাড়িয়ে একটা-কিছু আঁকড়ে ধরতে চায়। মন সেই বাহুভঙ্গীতে রুদ্রতা-ও দিতে পারে এবং পরাশ্রিততারও নম্র রেখা ফুটিয়ে তুলতে পারে। নৈরাশ্য এমনই একটি মনোভঙ্গী যা ভঙ্গুর কিম্বা ত্বক্‌মোক্ষণে পারদর্শী। আর আত্মপ্রতিষ্ঠার আদিম আবেগ এমনই উচ্চাদর্শী যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিনে প্রত্যেকটি মনই উচ্চাসন লাভের জন্যে আকাঙ্ক্ষা করে, ফলে মনোরথের চাকা প্রায়ই ভেঙে যায় এবং নৈরাশ্যের জন্ম হয়।

আমার মনে হয় এখনকার তরুণ কবিদের মধ্যে একমাত্র অরুণ সরকারই নৈরাশ্যের জন্মনক্ষত্র জেনে কবিতা-রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। এই নৈরাশ্য বাম-পন্থায় বা বামাচারে ধাবিত না হয়ে 'দূরের আকাশ' সন্ধান করেছে যা বস্তুত একটি উচ্চাসন। অরুণ সরকারের পক্ষেই আরেকটি তরুণতর কবিকে পাওয়া যায়, তিনি সুকুমার রায়। সম্প্রতি সুকুমার রায় তাঁর আসন পেতেছেন 'স্বগত'-গ্রন্থে এই বলে :

"স্বচ্ছ নীল আকাশের আবাসিক তুমি
বিস্তীর্ণ গোরস্থানে অন্ধকার বৃক্ষের চূড়ায়
স্থিরা ভব প্রেয়সী আমার
পূর্ণ চাঁদ।"

গোরস্থান গ্রে-সাহেবের শোকগীতি দিতে সমর্থ হলেও, আশঙ্কা আনয়ন করে। সুকুমার রায়ের স্বগতোক্তিগুলো এখনকার একটি হ্যামলেট চিত্তের ছবি দেখায়। দিলীপ রায়ের 'মুস্কিল আসান'-ও নার্সিসাস-বৃত্তিতে তেম্নি মুখচিত্র দেখায় যাতে আশা আসন্ন নয়। এসব চিত্ত আত্মরক্ষায় অসমর্থ, যতো ফিলজফিই উত্থিত হোক তা মথিত হয়ে। অরুণ সরকার আত্মরক্ষায় অনেক বেশি সেয়ানা। তাই নর-নারীর হৃদয়ের নির্দয়তায় অকাতর থেকে নিজেকে সুরক্ষিত করে নিয়েছেন। প্রেমসম্ভব নৈরাশ্যকে দু'ভাবে মুছে ফেলা যায়। প্রেমকে অন্তরীক্ষে বাঁচিয়ে রেখে নৈরাশ্য উড়িয়ে দেওয়া সম্ভবপর। অরুণ সরকার তা সার্থকভাবে দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, নৈরাশ্য-মোচনের বাস্তব দাবাইখানার চিত্রও তিনি পরিবেষণ করেছেন :

ঝলমল ফাল্গুনে পৌঁছে
মখমল সহৃদয় কৌচে
বসে নীল ধোঁয়া ছেড়ে স্বগত
কাকলি শোনাব লাল গ্লাসকে।

নায়িকা 'বিচিত্রা দাশ'-কে ভোলবার জন্যে নায়কের যে সাম্প্রতিক রুচিসম্পন্ন আয়োজন তা শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' দান করে থাকলেও এখন আর বোকা দেবদাস কেউ নেই।

অবশ্য 'মখমল সন্দর কৌচ'-ই যে সবার কাব্য ও কাম্য হবে তা নয়। নরেশ গুহ তাঁর 'দুরন্ত দুপুর' ভোগ বা উপভোগ করেছেন আরেক ভঙ্গীতে। তাঁর বিনয়ী ভঙ্গী এবং বাস্তবানুগ মন আমাদের দৃষ্টিকে দৃশ্যান্তরে প্রেরণ করে :

> "কলকাতায় বেঁচে আছি শুধু এই মহাপুণ্যবলে
> এখনো গলির মোড়ে সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় গ্যাস জ্বলে
> ভোরে কলে জল আসে, পাশের বাড়ির
> দ্বিতল রেলিঙে ঝোলে সদ্যস্নাত জাফরানী শাড়ির
> আঁচলের প্রান্তভাগ।"

স্বর্গের সিঁড়ি যাঁর দৃষ্টিতে এমন সহজ ও মৃত্তিকাশায়ী তাঁর মন নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ কবি-পক্ষে যেমন নেই পাঠক-পক্ষেও তেম্নি উধাও। অত্যন্ত সহজ, শিশু-সুলভ মন নিয়ে নরেশ গুহ কাব্যের আসরে আসতে সচেষ্ট। ডি-লা মেয়ার এমন একটি প্রচেষ্টায় বিফল-মনোরথ হয়েছেন ইংরেজি-সাহিত্যে। এ শিশু-সুলভতাকে খানিকটা মূল্যবান করে তুলেছেন তাঁর পক্ষ ঘেঁষে অরবিন্দ গুহ। তিনি সুরু করেছেন দুরন্ত দুপুরের জ্বালায় অস্থির হয়ে কাব্য-সাধনা। 'আঁচলের প্রান্তভাগ' সন্ধান করে পাথার আনন্দে তৃপ্তি পাওয়ায় তাঁর মন সায় দেয়নি। অতএব পেছন-পেছন ধাওয়া ও ব্যর্থতায় নৈরাশ্যের বুলি আওড়ানো এবং নৈরাশ্যের অন্তর্গত ফিলজফির সিঁড়ি ভাঙা তাঁর কাব্য-কৃতি হয়ে উঠেছে। তবে অরবিন্দ গুহের 'দক্ষিণ নায়ক'-গ্রন্থের কবিতা রবীন্দ্রাসক্তিতেও সিঞ্চিত হতে পেরেছে কথঞ্চিত, যেহেতু নরেশ গুহের অকিঞ্চিৎকরতায় তাঁর মন মোহগ্রস্ত নয়। তিনি স্পষ্টত বলেছেন :

"এই বৈশাখী দুপুর বেলার কলকাতাকে
বিশ্বাস নেই। হঠাৎ কোথায় কখন কাকে
শূন্য করবে কে বলতে পারে। তোমাকে বলি
ঘরে থেকো, আমি যেটুকু জ্বলার একলা জ্বলি।"

অরুণ সরকারের আদর্শ নায়ক সিগারেট জ্বালিয়ে মদের গ্লাসে যদি জ্বালা জুড়িয়ে থাকেন সে আদর্শও তরুণতম 'দক্ষিণ নায়ক' বর্জন করে এসেছেন। বাস্তব প্রেমের নিদারুণ অভিজ্ঞতায় জ্বলে পুড়ে নিসঃঙ্গতায় জ্বলতে চাইছেন অল্পবয়েসী এক কবি। রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁকে আশ্রয় দেন তো ভালোই। আমরা মনে করব যে রবীন্দ্রনাথ কল্লোলের ঘোলাটে দিনগুলো অতিক্রম করে পুনরুজ্জীবিত হচ্ছেন।

রবীন্দ্রনাথে পুনরুজ্জীবন যেমন কল্লোল-যুগের প্রথিতযশা কতিপয় কবির মারফৎ হচ্ছে তেম্নি বাম-পন্থাগত কবিবৃন্দের কতিপয়ও বৃন্তচ্যুতির আভাস-ইঙ্গিত দেখাচ্ছেন। তেমন একজন উল্লেখ্য কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। তাঁর 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা' গ্রন্থটি আমাদের মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করবে। তেম্নি পার্শ্ব-পরিবর্তনও হয়েছে। যাঁদের কাব্যজীবন স্থরু দক্ষিণ পন্থায় বা দক্ষিণ নায়ক হিসেবে তেমন কতিপয় তরুণও বামপন্থায় বললাভের জন্যে আশ্রয় নিয়েছেন। প্রমোদ মুখোপাধ্যায় ও চিত্ত ঘোষ এ-দলে উল্লেখ্য। পন্থা যে দোষাবহ তা নয়। দোষ বর্ত্তায় আন্তরিকতার অভাবে। ভাবের শূন্যগর্ভতায় অভাবের জন্ম। বামপন্থার অভাব-দোষ অনস্বীকার্য।

তরুণদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মনোভঙ্গীর উত্তরাধিকার নীরেন চক্রবর্তীতে প্রখরতম। তেম্নি জীবনানন্দ দাসের উত্তরাধিকার ভাগ-বন্টন করে যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অরুণ সরকারের চাইতে স্পষ্টতর বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। জীবনানন্দ দাসের মনোগহনতা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে অধিকতর স্পর্শ করেছে। নানা প্রতীকের

প্রতিকৃতি দর্শনে এর উপলব্ধি ও আস্বাদ। জটিলতা তাই এর সহচর। কবিতায় যাকে রূপকল্প বা 'ইমেজ' বলা হয় তার আবির্ভাব নানা প্রতীকের জ্ঞান থেকে আসে। অনেক ক্ষেত্রে তা অত্যধিক ব্যক্তিগত হয়ে দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি করে তুলতে পারে। বাংলা কবিতায় দুর্ব্বোধ্যতার স্বৈরাচার এক কালে আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া ছিল। সে-কাল যে এখনো ফল দিতে অসমর্থ তা নয়। ফলে আমরা তরুণ আনন্দ বাগচীর কবিতায় ('স্বগত সন্ধ্যা' গ্রন্থ) এ-ধরনের দুর্ব্বোধ্যতা বা ইমেজ পাচ্ছি :

"ছায়া-তরতর দুপুর-সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে
আচমকা কোন সেগুন-বনের কাঠবেড়ালীর
মুখের মতন থমথমে রোদ।" [ভেজা রোদের বিকেল]

কাঠবেড়ালী থেকে 'করাত-ঘর' পর্যন্ত কল্পনা দৌড়ে এসে 'সূর্য বিদেয়' বলে চিত্তানুভূতি দিচ্ছে। বর্মী সেগুনবনে বিচরণশীল না হলে এই কাঠবেড়ালীর চেহারা ধরে এনে রোদে ও রাত্রিতে মিলিয়ে দেওয়া শক্ত ব্যাপার।

রূপকল্পের দিক থেকে সুবোধ্য ও নবীন কবি যে আমরা পাইনি তা নয়। বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় এ-বিষয়ে সার্থকতা দেখাতে সমর্থ হয়েছেন তার 'অবতামসী'-গ্রন্থে। সুনীল নন্দী রূপকল্পে বিশ্বাসী হয়েও প্রাঞ্জল। সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের নামও এদিক থেকে উল্লেখ-যোগ্য। বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিকেলের ছবি এঁকেছেন তাতে 'রোদ'-ও আছে 'রাত্রি'-ও আছে আর আছে এমন সহজ তরতরে রূপকল্প :

"আজকে ফের মেঘের ঘের ছড়াল দশদিকে
বিকেল আলো ফেরার হল ·
আকাশ পটে শেষের চিঠি লিখে

সে-চিঠি-পড়া অবাক চোখ
তারার ছিল, তোমার হোক—
চোরাই করে সে-চিঠি নিলে শিখে…”

তরুণ কবিদের জন্যে পাঠক হিসেবে উপদেশ পত্র লিখে রাখবার অধিকার অর্জন করেছি বলে আমি মনে করিনে। তবে তাঁদের মধ্যে যিনি প্রবীণ তাঁর কয়েকটি পংক্তি 'নীল নির্জন' থেকে এ-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করছি ঃ

“আকাশে তবু রয়েছে রঙ ছড়ানো
এখনো তার খানিক দিয়ে
হৃদয় যায় ভরানো।”

প্রবন্ধগুলো অধুনা-লুপ্ত পূর্ব্বাশা ও নিরুক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ বই-এর তিনটি প্রবন্ধ নিয়ে 'তিনজন আধুনিক কবি' নামে একটি পুস্তিকা বেরয়। এ বইটিতে কবিতা-সম্পর্কে গ্রন্থকারের সব আলোচনা প্রকাশিত হ'ল। সব উল্লেখ্য কবিই যে আলোচনায় স্থান পেয়েছেন তা নয়; এ আলোচনার মূল্য যদি থাকে, তাহলে তা রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার মূল সূত্রগুলো দেখানোর মধ্যেই আছে। আর একটি কথা এই যে প্রবন্ধগুলো সাম্প্রতিক রচনা নয়; সব চাইতে যেগুলো নূতন রচনা তা-ও পাঁচ বছর আগেকার।